এখানে ওখানে সেখানে

আশাপূর্ণা দেবী

প্রকাশক
৮২/১ মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা-৯

এখানে ওখানে সেখানে : আশাপূর্ণা দেবী। ১৬ই পৌষ ১৩৬৯, ৮২/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯ থেকে "প্রকাশক" প্রকাশনা সংস্থার পক্ষে শিশির ভট্টাচার্য প্রকাশ করেছেন এবং নিউ পাল প্রেস ৬৭ এ. ডবলু সি, ব্যানার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৬ থেকে ছেপেছেন। প্রচ্ছদ শিল্পী পার্থপ্রতিম বিশ্বাস। গ্রন্থস্বত্ব গ্রন্থকর্ত্রী।

এখানে ওখানে সেখানে

শীত বিদায় নিয়েছে। বাড়ির ঘরে ঘরে, ডাইনিং স্পেসে টিভির সামনে প্রায় সবসময় ফুল ফোর্সে পাখা ঘুরছে। চৈতালী ছাড়া আর সকলেই প্রায় উঠে যাবার সময় পাখা নিভোতে ভুলে যায়।

প্রবাসজীবনের ঘরে কিন্তু এখনো পাখা প্রায় নিশ্চলই থাকে। ওরা কেউ এসে ঢুকলে বলে ওঠে, উঃ বাবা। আপনি কী? এই গরমে—খুলে দেয় পাখাটা।

কাটুম অথবা কাটাম এসে ঢুকলে হি হি করে বলে, দাদু তোমার লেপটা ভুলে ফেলেছ যে? গায়ে দেবে না?

প্রবাসজীবন অবশ্য এসব গায়ে মাখেন না। তাঁর মোটেই অত গরম হয় না। বরং ভোরের দিকে আর পড়ন্ত বেলায় পাতলা আলোয়ানখানা টেনে একটু গায়ে জড়ান। আজও তাই জড়িয়ে বসে বিকেলের ডাকে আসা চিঠিপত্তরগুলো দেখছিলেন। পুরনো দিনের জের হিসেবে এখনো কিছু পত্রপত্রিকা আসে। দু' একটা ইংরিজি

জার্নাল। এসবের মধ্যে থেকে একটা পরিচিত মেয়েলি হাতে ঠিকানা লেখা একটা ডাকের খাম দেখে অবাক হলেন। পরিচিত, কিন্তু প্রায় বিস্মৃত।

চিঠিখানা বার দুই পড়লেন। আর অজ্ঞাতসারেই গায়ের ঢাকা আলোয়ানটা খুলে ফেললেন।

ভিতরে ভিতরে একটা চাঞ্চল্য বোধ করলেন। কী করে ওদের কাছে কথাটা বলে ফেলবেন।

কেন জানি না 'প্রণতি' চলে গিয়ে পর্যন্ত বাড়ির অন্যসকলের সম্বন্ধে ভাবতে গেলেই প্রবাসজীবন সবাইকে এক এক করে ভাবেন 'ওরা', 'ওদের'।

অথচ 'ওরা' কে? ছেলে দিব্য, ছেলের বৌ চৈতালী আর তাদের ছেলে মেয়ে 'কাটুম কাটাম'। অবশ্য আরো একজন আছে। ছোট ছেলে সৌম্য। কিন্তু সে আর কতক্ষণই বা বাড়িতে থাকে? আর কার সঙ্গেই বা তার যোগ? সে 'ওদের' ও কেউ নয়, প্রবাসজীবনেরও কেউ নয়। বরাবরই একরকম। বাড়ির কোন কিছুর সঙ্গেই ও একাত্ম নয়।

তবু প্রণতি থাকতে সূক্ষ্ম একটু সুতোয় বোধহয় বাঁধা থাকতো, সেই পলকা বাঁধনটি ছিঁড়ে গেছে।

ইউনিভার্সিটির খাতায় নামটা লেখানো আছে বটে। ঠিকমত যায় কী না কে জানে। অথবা হয়তো যায়। তবে পড়াশুনো করতে দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু কোন রাজনীতির দাদার কাছেই কি টিকি বেঁধেছে? তাও তো মনে হয় না। তবে কেউ তাকে নিয়ে মাথা ঘামায় না। বাড়িতে দু'বেলা খায় আর রাত্রে ঘুমোয় এই যথেষ্ট।

অথচ প্রবাসজীবনের প্রাণের মধ্যে একটা গভীর ইচ্ছার পিপাসা। ভাবতে ইচ্ছে করে 'সুমু' আমার। ইচ্ছে করে সুমু তাঁর ঘরে এসে এক আধবার একটু বসুক। একবার তার গায়ের গন্ধ অনুভব করেন প্রবাসজীবন। তার মুখটার দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে দেখেন।

কোলের এই ছেলেটা লম্বায় বাবা দাদার মতো হলেও চেহারায়

বসানো মা। মুখের আদলে চিবুকের ডৌলে কথা বলার সময় চোখের কোণের ঈষৎ ভাঁজ খাওয়ায় আর হাসিতে। দেখলে হঠাৎ মনে হয় বুঝি প্রণতিই হেসে উঠল।

তা এখন আর সে হাসি দেখছেন কখন প্রবাসজীবন? হাসির শব্দটুকুই কখনো কখনো শুনতে পান। হাসে। গোমড়ামুখো তো নয়। কিন্তু যা কিছু সবই ওই ভাইপো ভাইঝির সঙ্গে। বাড়িতে যেটুকু সময় থাকে ওরাই পায় তাদের কাকাই'য়ের সঙ্গ।

হ্যাঁ। কাকু নয় 'কাকাই'। এটাই চালু হয়ে গেছে।

প্রণতি তো ছিলেন একদা।

ছিলেন এ বাড়ির সবকিছুর মধ্যে। যেন শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো। প্রণতি তাঁর নাতনীর বাক্‌স্ফূর্তির সময়ই বলেছিলেন, 'বাপী' আবার কী? বাপী-টাপী বলবি না। ন্যাকা ন্যাকা লাগে। বাবাই তো সব থেকে ভালো রে। আসল ডাক।

কাটুম কী বুঝলো কে জানে, চালু করল 'বাবাই'। তো কর বাবা তাই চালু। পরবর্তী জনও তাই। এবং 'বাবাই'য়ের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে কাকাই।

প্রবাসজীবন ভাবেন তা ওই সামান্য সময়টুকুও তো কাকা ভাইপো ভাইঝি এঘরে বসেই আসর জমাতে পারে।

কিন্তু তা করে না ওরা।

ওদের পরিমণ্ডলেই থাকে।

অথচ প্রবাসজীবনের ইচ্ছে হলেও ঠিক সুবিধে লাগে না চির অনভ্যাসের বাধা সরিয়ে নিজের কেন্দ্র থেকেই বেড়িয়ে পড়ে বাড়ির অন্যত্র গিয়ে কারো সঙ্গের আস্বাদ নিতে। তাছাড়া হার্টের রোগী বলে ছাপ মারাও তো। এবং ইদানীং পায়ে একটা বাতের ব্যথার মতো হওয়ায় আরোই ঘরবন্দী।

বাড়ির মধ্যে সবথেকে খোলামেলা ঘর এইটাই। যখন বাড়ি তৈরি করিয়েছিলেন তখন প্রণতিই ঘরটার প্ল্যানের ওপরও জানালার সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আর ঘরের যে দিকে বারান্দা থাকার কথা

নয়, সেদিকেও একখানা 'ব্র্যাকেট ব্যালকনি' করিয়ে ছেড়েছিলেন।

প্রবাসজীবন বলেছিলেন সব দেওয়ালগুলোই যদি জানলা দরজায় খেয়ে নেয়, বইয়ের র‍্যাক আলমারি থাকবে কোথায়?

আমার মাথায় রেখো।

বলে হেসে গড়িয়ে পড়েছিলেন।

সে কবে?

তখন বোধহয় দিবু ক্লাস টেনের ছাত্র। আর মুমু ক্লাস ফোরের।

কিন্তু সেরকম হাসি কি গিন্নীবান্নী হয়েও ছাড়তে পেরেছিলেন প্রণতি?

ওঃ। প্রণতি থাকলে কী আজ এই সামান্য চিঠিখানার ব্যাপারে ভাবতে হতো প্রবাসজীবনকে?

আলোয়ানটা খুলে ফেলেছেন গা থেকে। জানালা দিয়ে একটু হিমেল হিমেল হাওয়া আসছে। তবু সেটা ভালই লাগল প্রবাস-জীবনের। এবং চিঠির কোণটা সামনের ছোট টেবিলটার ওপর ঠুকতে লাগলেন অন্যমনস্কের মতো। চট করে কী করে কথাটা বলে ফেলা যায়।

চৈতালী ঘরে এল।

সঙ্গে ভূষণ। ভূষণের হাতে স্টেনলেসের ট্রে-তে প্রবাসজীবনের চা আর বৈকালিক জল খাবার ছানা এবং দু'খানা ক্রীম ক্র্যাকার বিস্কুট।

সামনে নামিয়ে রেখে চলে গেল ভূষণ। চৈতালী পাশের হালকা বেতের সোফাটায় বসল। ভারী 'ডিউটি' সচেতন মেয়ে চৈতালী। যতদিন থেকে প্রবাসজীবনকে ঘরে চা খেতে বলা হয়েছে ততদিন যাবৎই সকাল সন্ধ্যা চৈতালী ভূষণের সঙ্গে এসে যায়। খাওয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত বসে থাকে।

প্রকৃতপক্ষে বলতেই হবে চৈতালীই এখন প্রবাসজীবনের সংসারের সঙ্গে সংযোগ সেতু।

এই সময় চৈতালীর সঙ্গে টুকটাক কথা হয়। যা থেকে বাড়ির ঘটনা সম্পর্কে একটু ওয়াকিবহাল হওয়া যায়।

আসল খাওয়া ছুটোর সময়, অবশ্য প্রবাসজীবন ঘরে বসে খেতে রাজি হন না। বাড়ির বর্তমান ভাষায় 'লাঞ্চ' আর 'ডিনার'।

তবে এখন তো আর খাবার জন্য একতলায় নামতে হয় না? প্রণতি চলে যাবার কিছুদিন পরেই প্রণতির সাধের 'খাবার ঘর'কে বাতিল করে দিয়ে দোতালায় মাঝখানের হল-এ উঠিয়ে এনেছে খাবার টেবিল চেয়ার ফ্রীজ, খাওয়ার টেবিলের ধারের সাইড বোর্ড।

এখানেই হালকা একটি পার্টিশনের সাহায্যে পৃথক করা হয়েছে। 'ড্রইং এবং 'ডাইনিং' রুমকে।

বারে বারে কে অত একতলায় নামে বাবা! বাচ্চারাও যেতে চায় না। নিচেটা যেন কেমন ফাঁকা ফাঁকা। প্রণতির একার উপস্থিতিতেই যে কী আশ্চর্য জমজমাটি ছিল।

তখন বাড়িতে সর্বদাই কথার চাষ চলতো। গিন্নী তো একাই একশো। দায়ে পড়ে সকলকেই কিছু কথা বলতে হতো। আর গলা খুলেই।

এখন কী যে বদল ঘটে গেছে।

কেউ আর গলা খুলে কথা বলে না।

সব যেন চুপচাপ। আস্তে কথা আস্তে হাসি।

জমজমাটি যা কিছু দূরদর্শনের পর্দায়। ওরাই নাচে গায় গলা ছেড়ে কথা বলে।

সকলের এই আস্তে কথা আস্তে চলা বলার মধ্যে প্রবাসজীবনও আর হঠাৎ তাঁর সেই নিজস্ব স্টাইলে জোর গলায় ডেকে উঠতে পারেন না 'ভূষণ'। অথবা 'দেবু'।

হ্যাঁ ওরা আছে।

শুধু বালক দেবুর গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে, আর সদ্য যুবক ভূষণ আর একটু যুবক হয়ে উঠেছে। ওরাও এখন বাড়ির ধারায় চলে। এখন আর ভূষণ ভাবতেই পারে না রান্না করতে করতে হঠাৎ এক লাইন গান গেয়ে উঠবে হিন্দি সিনেমার।

চৈতালী বলল, দুপুরে একটু রেস্ট নিয়েছিলেন তো বাবা?

প্রবাসজীবন হেসে ফেলে বললেন, রেস্ট তো সবসময়ই মা।

বাঃ। তা কেন? কতদিন তো সারা দুপুর বই পড়েন।

প্রবাসজীবন জানেন, এ শুধু কথায় জন্যে কথা বলা। সৌজন্য-বোধের শিক্ষা আছে মেয়েটার।

তিনিও সেই শিক্ষাতেই হেসে ফেলে বললেন, সে এক আধদিন হঠাৎ কোন বই ভালো লেগে গেল।

পরক্ষণেই এতক্ষণের মুসাবিদা অনুযায়ী ফস্ করে চিঠিখানা চৈতালীর দিকে এগিয়ে দিয়ে যেন কৌতুকের গলায় বলে উঠলেন তোমার সংসারের তো আর একটি মেম্বার বেড়ে গেল। দেখ খুলে।

চৈতালীর ভুরুটা কী একটু কুঁচকে উঠল? হয়তো, নয়তো নয়। চিঠিটা হাতে নিয়ে বলল, এ তো আপনার নামে—

আহা নামটা তো আমারই হবে। ভারটা তো তোমার ওপরই পড়বে।

ভাঁজ খুলে চিঠিঠা পড়ল চৈতালী। তারপর নীরবে নিঃশব্দে আবার ভাঁজ করে ছানার প্লেটের পাশে টেবিলের একধারে নামিয়ে রাখল।

কণ্ঠে কোনো মন্তব্য নেই। মুখের রেখায় কোন তাপ উত্তাপ নেই।

ভারী যেন অপ্রতিভ হয়ে গেলেন প্রবাসজীবন। ভেবেছিলেন সামান্য কিছু ও মন্তব্য করবে। অথবা একটু প্রশ্ন। বলতেও তো পারতো,—'লাবু' কে?

খুব একটা জানবারও তো কথা নয়। বিয়ের সময় দেখেছে হয়তো। তো অত কী মনে থাকে? বিয়ের সময় নতুন বৌ তো কতজনাকেই দেখে।

কিন্তু প্রশ্ন করল না চৈতালী!

অপ্রতিভ প্রবাসজীবন ছানার ডিশটা একটু টেনে নিয়ে গলাটা ঝেড়ে খুব বেশী সহজ সুরে বলে উঠলেন, লাবু কে বুঝতে পারছো তো? আমার পিসিমার মেয়ে। এসেছিল তোমাদের বিয়ের সময়।

ছিল ক'দিন। তোমার শাশুড়ীর সঙ্গে তো আবার খুব গলায় গলায় ভাব ছিল। ছাড়তেই চাইছিল না। অল্প বয়েসে বিধবা। এক সময় তো বলতে গেলে আমাদের বাড়িতেই মানুষ হয়েছে। ঠাকুমার বেশীর ভাগ সময় অসুখ বলে, পিসিমা এখানেই থাকতেন প্রায়।

চৈতালী শুধু বলল ও!

প্রবাসজীবন একটানা এতগুলো কথা বলে ফেলার পর এখন একটু কণ্ঠস্বর শুনে কিঞ্চিৎ সাহস পেয়ে বললেন, তো বেচারীর অসময়ে স্বামী মারা যাওয়ায়—ইয়ে পড়লে তো চিঠিটা? জানলে তো সব?

তা অবশ্য পড়েছে।

একনজরেই পড়ে ফেলেছে এবং বুঝে ফেলেছে!

লাবুর চিঠির সারাংশই এই···ভগবানের দয়ায় (সারাজীবন ভগবানের নির্দয়তা দেখে দেখেও ভগবানের দয়ায় মোহিত হয় লোকে!) তার বড় ছেলে পাশ করে বেরিয়েই কলকাতায় একটা চাকরী পেয়ে গেছে। পাশ অবশ্যই স্রেফ বি. এ. পাশ। তা যাক চাকরী তো পেয়ে গেছে। কিন্তু এখন সমস্যা এই প্রতিদিন হুগলী থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারী করা এখনকার এই গোলমেলে দিনে খুবই কষ্টের আর অসুবিধের। নিত্যই ট্রেন চলাচলের বিঘ্ন। আবার কলকাতায় মেস-এ থেকে নিজের খরচা চালিয়ে বাড়িতে মাকে টাকা পাঠানো সেও তো প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া ঠিক মতো ভদ্র একটা মেস-এ সিট পাওয়াও তো সহজসাধ্য নয়। তাই সে ছেলেকে প্রবাস-দার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছে। এখান থেকেই অফিস করতে পারলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়।

প্রবাসদার বাড়িতে তো জায়গার অভাব নেই। লাবু তো দেখে গেছে অনেক ঘর। আর খরচ? সে কথাটা লাবুর তার প্রবাসদার মুখের ওপর বলতে পারার মতো বুকের পাটা নেই। তবে ছেলে তার অবুঝ নয়। ন্যূনতমতেই তার চলে যায়।

চিঠি লিখে উত্তর পাবার মতো 'সময়' আর হাতে নেই। অতএব সামনের সোমবারেই যাচ্ছে সে। সোমবারেই জয়েনিং ডেট।

লাবু আরো লিখেছে, বোকা ছেলেটা বড়মানুষ মামার কাছে যেতে ভরসা পাচ্ছে না। কেবলই সস্তার মেস-এর কথাই বলছে। তো আমি ভরসা দিয়েছি 'বড়মানুষ' হয় দু'অর্থে, বুঝলি বাবা? দেখবি গিয়ে তোর প্রবাসমামা আসল অর্থে 'বড়' মানুষ। বড্ড মাপের।

লাবুর হাতের লেখাটি বড় পরিস্কার। সহজ পাঠ্য।

চিঠির ভাষার এই কারুকার্য দেখে চৈতালী মনে মনে তিক্ত বঙ্কিম হাসি হেসেছে তবে ওর মুখের রেখায় তো কিছু ধরা পড়ে না।

প্রবাসজীবনের এতগুলো কথার পরও চৈতালী মন্তব্যহীন ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়ে নিত্যদিনের মতোই প্রশ্ন করল, রাত্রে রুটিই খাবেন তো বাবা?

হ্যাঁ, এ প্রশ্নটি চৈতালী সেইদিন থেকে রোজই করে। কবে যেন একদিন প্রবাসজীবন রাত্রে বলেছিলেন আর রুটিটা খেতে ইচ্ছে করছে না। বরং দুখানা টোস্ট খেলে হয়।

সেইদিন থেকেই।

প্রবাসজীবন এই প্রশ্নের আকস্মিকতায় থতমত খেয়ে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ।

চৈতালী চলে গেল।

প্রবাসজীবন অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন, এরা কত সহজে মানুষকে নস্যাৎ করে দিতে পারে।

মানুষ! মানে বাড়ির সব থেকে প্রধান মানুষ।

কিন্তু এখন কী আর সেকথা বলা চলে?

প্রবাসজীবন তাঁর সারা জীবনের 'অ্যালবামটা' খুলে দেখবার চেষ্টা করলেন।

'প্রধান' তো সব সময়।

যদিও প্রণতির এক মজার ধরনের প্রাধান্য ছিল। সে তো সব সময় বলে উঠতো, তুমি থামো তো বাপু। তুমি আর সংসারের সব ব্যাপারে নাক গলাতে এসো না।

কিন্তু তাতে কি প্রবাসজীবনের সংসারে, 'প্রধান' হওয়ায় কোনো

বাধা ঘটেছে ? প্রবাসজীবনকে কি কখনো নিজের ইচ্ছা পূরণের জন্যে কারো কাছে আর্জি করতে হয়েছে ? না কি নিজেকে অনধিকারী অনধিকারী মনে হয়েছে ?

এখন কেন প্রতি পদে নিজেকে এমন সব ব্যাপারেই অধিকারহীন মনে হয় ? কেন এমন সাহস হারিয়ে ফেলেছেন ?

প্রণতিই কী তাঁর ভরসার খুঁটি ছিলেন ?

ভাবতে ভাবতে প্রবাসজীবনের অ্যালবামের পুরনো পুরনো পাতাগুলোর মধ্যেই বারে বারে চোখ আটকে যেতে লাগল।

প্রবাসজীবনের দিকের যত আত্মীয়স্বজন তাদের ব্যাপারে যা কিছু কর্তব্য করণীয় প্রবাসজীবন কবে আবার তা দেখতে গিয়েছেন ? বরং প্রণতির নিখুঁত নিটোল ব্যবস্থায় মোহিত হয়েছেন। এমন কি কখনো কখনো এমন অনুযোগও করেছেন, তোমার যেন সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি। পিণ্টুর মেয়ের বিয়েতে এত দামী শাড়ি দেবার কী ছিল ?

প্রণতির চটপট উত্তর, বাঃ। পিণ্টু তোমার সম্পর্কে খুড়তুতো ভাই না ? আজেবাজে একটা শাড়ি দিলে ভাল দেখাবে ?

আর এই লাবুর ব্যাপারেই—

আচ্ছা লাবুর এই ছেলেটা যে না কি চাকরী করতে আসছে, কত বয়েস তার ? মনে হচ্ছে যেন এই সেইদিন তার অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্নে গিয়েছিলেন প্রবাসজীবন আর প্রণতি ওদের হুগলীর বাড়িতে। তখন লাবুর শ্বশুর শাশুড়ী বেঁচে।

প্রণতি প্রায় একখানা তত্ত্বই সঙ্গে নিয়ে গেল।

বাচ্চার চেলির জোড়, রুপোর বাটি, ছোট্ট সিল্কের পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবিতে ক্ষুদে ক্ষুদে সোনার বোতাম পরানো তাছাড়া মিষ্টি টিষ্টি।

প্রবাসজীবনের অবশ্য ভালই লেগেছিল। তবু হেসে বলেছিলেন এতো দিতে হয় বুঝি ?

প্রণতি ঝঙ্কার তুলেছিল, বাঃ। হবে না ? তুমি মামা নও ? মামার বাড়ি থেকে মুখে ভাতের তত্ত্ব আসবে না ?

পরে ভেবেছিলেন ভাগ্যিস দিয়েছিল প্রণতি অমন সাধ আহ্লাদ করে। দ্বিতীয়বার তো আর সন্তানের মুখ দেখল না লাবু। বেচারী। কী অকাল বৈধব্য।

তো প্রণতি সারাজীবনই তার প্রতি সহানুভূতিশীল।

এই তো বড় ছেলের বিয়ের সময়ও প্রণতি লাবুকে জোর করে এনে ছেড়েছিল।

ও বলতো উৎসব বাড়িতে যেতে ওর লজ্জা করে।

প্রণতি সে কথা গায়ে মাখেনি।

আর নিয়ে আসার পর ছাড়তেই চাইছিল না। ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প চালিয়েছে।

হঠাৎ মনে হলো প্রণতি যদি আজ থাকতো?

নিশ্চয়ই বলে উঠতো, ও মা! ছাখো কাণ্ড! একটা ছেলে বৈ তো নয়। থাকবে তাতে অসুবিধে কী? লাবু ঠাকুরঝি এতো কিন্তু করে লিখেছে কেন বাবা? মফস্বলের ছেলেরা কলকাতায় আত্মীয় বাড়ী এসে লেখাপড়া কি কাজকর্ম করে না? কত দূর দূর সম্পর্কেই করে, আর এ তো মামার বাড়ি।

এখন আবার হঠাৎ হু হু করে আসা বাতাসটায় গা শিরশির করে উঠল। খুলে রাখা চাদরখানা আবার গায়ে জড়িয়ে নিলেন। একটু পরে দিবু ঘরে ঢুকল। বড়ছেলে দিব্যজীবন।

এটা প্রবাসজীবনের পরম আকাঙ্ক্ষিত। ছেলেরা ওঁর ঘরে এসে একটু বসুক। কিন্তু আজ বুঝলেন, এই আসাটা নিছক বাবার কাছে এসে একটু বসার জন্যে নয়। মনে হওয়াটা ভুল হলো না।

দিব্য এসেই বিনা ভূমিকায় বলে উঠল, শুনলাম নাকি লাবু পিসীর ছেলে এখানে থাকতে চায়।

প্রবাসজীবন একটু নড়েচড়ে বসে হাসবার মতো গলায় বললেন, ছেলে চায় না। ছেলের মা চায়। এই যে এই চিঠিটা পড়ে ছাখো।

ছাখার দরকার নেই। তবে আমার মতে এটা ওঁর অন্যায় আবদার।

অন্যায় আবদার।

নিশ্চয়। আজকালকার দিনে একটা বাইরের ছেলেকে বাড়ির মধ্যে রাখা। খুবই রিস্কি।

প্রবাসজীবন আহত গলায় বললেন, লাবুর ছেলে বাইরের ছেলে?

আমার তো সেটাই ধারণা! বাবার পিসতুতো বোনের ছেলে।

প্রবাসজীবনের যেন সম্পর্কের হিসেবটা বুঝতে একটু সময় লাগল। ওঃ। ছেলেটা প্রবাস জীবনের 'ভাগ্নে' নয়। এদের বাবার পিসতুতো বোনের ছেলে।

হঠাৎ একটু রাগ এসে গেল প্রবাসজীবনের। কথাটার মানে কী? বাড়িটা কী ওদের? প্রবাসজীবনের সারাজীবনের সঞ্চয় দিয়ে তৈরী নয়? এই বাড়ি, এই সংসার, এর সমস্ত সাজসজ্জা আসবাবপত্র বলতে গেলে কাঁটা পেরেকটি পর্যন্ত প্রবাসজীবনের অর্থে সংগ্রহ করা নয়?

প্রণতির আপ্রাণ চেষ্টা আর যত্ন, স্বপ্ন আর সাধ মিশে নেই এ বাড়ির প্রতিটি পরসে পরসে? এখানে প্রবাসজীবন তাঁর একটা স্নেহভাজন আত্মীয়কে জায়গা দিতে পারেন না? হিসেব করে ধরতে হবে এটা দিব্যর লাবুপিসির অসঙ্গত আবদার?

সভ্যতা নেই ভব্যতা নেই? কর্তব্য জ্ঞান বলে কিছু নেই? সেন্টিমেণ্ট বলেও কিছু সেই? বলি, বাড়িটা কী তোদের? আর এখনো কী প্রবাসজীবনের পেন্সনেই সংসারের অনেক খরচ নির্বাহ হয় না? চিরকালের অভ্যাসে ওই ভূষণ আর দেবুর মাইনেটা নিজের হাতে দেন প্রবাসজীবন। হয়তো সেই বাবদই এ বাড়িতে ওদের অন্ন 'ওঠেনি'। নচেৎ করেই ওদের বাড়তি মাল বলে বিদায় দিয়ে বসতো বর্তমান কর্তা গিন্নী। তবে সর্বদা 'টাইট' দিয়ে চলে তাদের।

এবং ওরা কখনো কোনো সময় নিভৃতে একটু কথা বলার সুযোগ ঘটলেই গলা নামিয়ে বলে 'আপনি যতক্ষণ আছেন ততক্ষণই এ বাড়িতে থাকব বাবু। তার পর আর একদিনও নয়।'

প্রবাসজীবন বলেন, আচ্ছা বাবা আচ্ছা। থাম।

হ্যাঁ, চোখের ওপরই দেখতে পান প্রবাসজীবন এ যুগের ন্যায় অন্যায়ের মাপকাঠির সঙ্গে তাঁর মানসিকতা মাপকাঠিতে আকাশ পাতাল তফাৎ। তবু সাহস করে ন্যায়ের পক্ষে কথা বলে উঠতে পারেন না।

অন্যায় তো ঘটছেই।

এ যুগে 'চাকর বাকর' বলা হয় না। সেটা নাকি অমানবিকতা। তাই বলা হয় 'কাজের লোক'। আর তাকে কেবলমাত্র 'কাজের যন্ত্র' বলেই ভাবা হয়। তাদেরও যে একটা হৃদয় আছে, সুখ, দুঃখ বোধ আছে, মান-অভিমান আছে, তা খেয়াল করা হয় না।

তাই ওদের 'অভিমান'কে বলা হয় আস্পদ্দা। বদমাইসী।

মাঝেমাঝেই উত্তেজিত দিব্য এসে প্রবাসজীবনের আহ্লাদে গোপাল যুগলদের নামে তীব্র বিরক্তি জানিয়ে যায় এবং পরোক্ষে বুঝিয়ে দিয়ে যায় প্রবাসজীবনের আস্কারাতেই এমনটা হয়েছে।

হ্যাঁ সবই দিব্য-ই বলে। চৈতালীর মুখ থেকে একটি টুঁ শব্দও বেরোয় না।

সে যাক—প্রবাসজীবন তো কই তখন দৃঢ়তার সঙ্গে ন্যায়ের পক্ষে কথা বলতে পারেন না। ওদের বিরুদ্ধতা? বাবা! ভয়েই সারা হন। বলে ওঠেন, হুঁ। যত পুরনো হচ্ছে ততই দেখছি মাথায় চড়ছে। ছেড়ে গিয়ে দেখুক না এত সুখের চাকরী কোথায় জুটবে?

বলে উঠতে পারেন না, 'তোদেরও বাপু অন্যায়—'

বলে উঠতে পারেন না, সবসময় আর তোদের ওই অভিযোগ অনুযোগ শুনতে পারি না বাপু, দে ওদের বিদেয় করে দে।

সাহস হয় না। জানেন তাতে আগুন জ্বলবে।

এ যুগে একটা কাজের লোক পাওয়া তো ভগবান পাওয়ার তুল্য। এরা চলে গেলে চৈতালীর কষ্টের একশেষ হবে।

তখন? তখন হয়তো আবার প্রবাসজীবনেরই অবিমৃষ্যকারিতার কথা শুনতে হবে। এবং শুনতে হবে—ইচ্ছে করেই তিনি চৈতালীকে এই অসুবিধেয় ফেলেছেন তাঁর আহ্লাদে গোপালদের মান বাঁচাতে।

ভয়। সর্বদা কেন যে এমন ভয়ের মধ্যে থাকতে হয় তাঁকে নিজেই বুঝতে পারেন না।

আচ্ছা প্রণতির সংসারে কি কখনো 'ভয়' বলে জিনিসটা ছিল প্রবাসজীবনের?

এখন কেন এত ভয়? এমন অধিকারহীনতা। ন্যায্য কথা বলার সাহস হারিয়ে ফেলা।

তাই প্রবাসজীবন বলে উঠতে পারলেন না, লাবু হয়তো এদিক দিয়ে ভাবেনি দিব্য। ভেবেছে বাড়িটা তার প্রবাসদার। আর জায়গারও অভাব নেই।

পারলেন না।

শুধু বললেন, 'অবশ্য বাড়ির মধ্যে' আর কী নীচের তলায় দু দুটো ঘর তো এমনিই পড়ে রয়েছে। ওখানেই থাকতে দেওয়া যেতে পারে।

দিব্য ঠোঁট কামড়ে বলে, তা জানি। দুটো ঘর বেকার পড়ে আছে। এবং সেটা একটা মস্ত বোকামির নিদর্শন হয়ে। ঘর দুটোয় টেনাণ্ট বসালে এখন সংসারে একটা মোটা আয় হতো।

হতো কিন্তু হওয়াবার উপায় নেই।

খাবার টেবিল আর ভাঁড়ারের আলমারি দোতলায় তুলে আনার পর বড়ছেলে প্রস্তাব করেছিল ঘরদুটো ভাড়া দেবার।

কিন্তু এই একটি জায়গায় প্রবাসজীবন ওদের মতে সায় দিতে পারেননি। পারেননি, সে হয়তো—সেই তাঁর চিরকালের 'শক্তির' জোরেই। বলেছিলেন, আমি থাকতে হবে না বাবা। তোদের মা বলতো, অভাবে পড়লে বরং একবেলা খেও, তবু বাড়ির মধ্যে কখনো ভাড়াটে বসিও না।

ছেলে বৌয়ের মতে এটা হচ্ছে একটা যুক্তিহীন সেন্টিমেণ্ট। কথায় কথায় অমন কত কথা বলে মানুষ। সেই সবই কী বেদবাক্য বলে মানতে হবে?

তবু সেটা মানা হচ্ছে এখনো।

প্রবাসজীবন বললেন, তা সেটা তো হয়নি। ওই খাবার ঘরটাতেই একটা চৌকী-টৌকী পেতে—

দিব্য তীক্ষ্ণ শ্লেষের গলায় বলল, সমস্যাটা শুধু শোবারই ?

আহা তাই কী আর বলছি রে বাপু ? তবে পাঁচজনের সংসারে একটা মানুষ বাড়লে আর কতটাই বা—

অনেকটাই বাবা।

স্বর আরো তীক্ষ্ণ হয়।

এখনকার বাজার সম্পর্কে আপনার কোনো আইডিয়াই নেই। তাছাড়া—খরচটাই কি সব ? একটা বাড়তি মানুষ বাড়িতে থাকায় একটা দায়িত্ব নেই ? কাকে নিতে হবে সে দায়িত্ব ? চৈতালীকেই তো ?

তবু মরীয়া হয়ে বলে উঠলেন প্রবাসজীবন মানে দায়িত্ব আর এমন কী ? ভূষণ রয়েছে দেবু রয়েছে।

ওঃ। ভূষণ। দেবু। মানে ওই পাজীদের আর একটা বন্ধুবৃদ্ধি। আপনি গ্যারান্টি দিতে পারেন একটা ওই বয়েসের ছেলে পার্টি পলিটিকসে যুক্ত কিনা ? বাড়িতে অন্য আবহাওয়া এনে জড়ো করবে কিনা ? তবে হ্যাঁ, বাড়ি আপনার। যাকে ইচ্ছে থাকতে দেবার রাইট আছে আপনার তবে আমাদের পক্ষে তা'হলে ভাবতে হবে।

প্রবাসজীবনের মাথায় কী কেউ হঠাৎ একটা হাতুড়ি বসিয়ে দিল ? তা নইলে হঠাৎ চোখে অন্ধকার দেখলেন কেন ?

কিন্তু সামলে নিতে হবে বৈকি !

অতএব সামলালেন।

একদম বোকা বোকা আর ভয়ের গলায় বললেন, ও বাবা বলিস কী ! এতোটা তো ভেবে দেখিনি। আজকাল তো শুনি মফস্বলের ছেলেরাই বেশি পলিটিক্স করে। থাকগে বাবা কাজ নেই। বলে দেব কিছু।

রাত্রে খাওয়ার টেবিলে হঠাৎ কাটাম হি হি করে হেসে উঠে বলল, দাদু, দাদু ! কোথাকার কোন পাড়াগাঁ থেকে নাকি তোমার কে

আসবে। এসে গাদা গাদা খাবে আর ভূষণদার সঙ্গে বিড়ি টানবে।

হঠাৎ ছেলেটার গালে একটা ঠাশ করে চড় পড়ল।

এবং তাকে কান ধরে তুলে নিয়ে চলে যাওয়া হলো খাওয়ার টেবিল থেকে। কিন্তু সম্পূর্ণ নিঃশব্দে।

প্রবাসজীবন প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে উঠলেন, ওকী! ওকী! ছেলেমানুষ কী বলছে না বলছে—ও দিব্য। বল না—

দিব্য কড়া গলায় বলল, আপনি খাচ্ছেন খান তো। সব ব্যাপারে মাথা ঘামাতে আসেন কেন? মা তার ছেলেকে শাসন করবে না?

* * *

লাবু ঘরবার করছিল।

কতক্ষণে বাড়ি ফিরবে অরুণ।

হ্যাঁ, আজ বাড়ি ফেরারই কথা। প্রথমদিন অফিস করে মামার বাড়িতে দেখাশোনা করে নিয়ে আগামীকাল একেবারে অফিস যাবার আগে ভোরের ট্রেনে নিজের সুটকেস-ফুটকেস নিয়ে চলে যাবে। কাল থেকেই কলকাতায় স্থিতি।

আজ লাবু ছেলের দুটো অভিজ্ঞতা শোনবার জন্যে হাঁ করে বসে আছে। অফিসের অভিজ্ঞতা, মামার বাড়ির অভিজ্ঞতা।

আহা! বৌদি যদি থাকতো!

হয়তো বলে বসতো তুই আর ওখানে একা পড়ে থাকবি কেন লাবু? তুইও চলে আয়।

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ পার হয়ে গেছে। এখন বেশ রাত।

গ্রাম এখন আর গ্রাম নেই। তবু এই সন্ধ্যার পর জ্যোৎস্নার ওড়নাটা গায়ে জড়ালে যেন একটু মায়াময় লাগে।

দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ পেতেই ছুটে এলো লাবু।

প্রথমেই বলল, কী রে? অফিস কেমন লাগল?

অফিসের আবার কেমন কী? একটা লোয়ার ডিভিশান ক্লার্কের যেমন লাগে তেমনি।

লাবু বলল, আচ্ছা মুখ হাত ধুয়ে চা খাবার খা। তারপর মামার বাড়ির গল্প শুনবো।

অরুণ হেসে উঠে বলল, মামার বাড়ির গল্প? ছিলাম তো মাত্র মিনিট পনেরো। তার আবার এত কী গল্প?

ওমা! সেকী! মোটে পনেরো মিনিট ছিলি?

বাঃ। ছটা চল্লিশের ট্রেনটা ধরতে হবে না?

তা বটে!

তো আয় ওইটুকুই শুনি। মামা কী বললেন, মামাতো দাদারা কী বললো? আর বৌদি? আহা আজ যদি মামী থাকতো!

লাবুর মধ্যে এখন স্মৃতির সমুদ্র তোলপাড় করছে। তোলপাড় করছে আর এক সমুদ্র। কাল থেকে আর অরুণের জন্যে কিছু করতে হবে না তাকে। সেই শনিবার সন্ধ্যে আর রবিবার দিনটি।

লাবু মনে মনে ঠিক করে রেখেছে সোমবার দিনও সে ভোরে উঠে রান্না করে ছেলেকে পাঠাবে। এখান থেকেই একেবারে অফিস চলে যাবে। সন্ধ্যায় ফিরবে মামার বাড়িতে।

সাধারণ বুদ্ধি। সাধারণ ছকে চিন্তা।

সহজ অঙ্ক।

আজ লাবু ছেলের জন্যে তার প্রিয় খাবারগুলির কিছু কিছু করেছে। বেশী আর করবে কী করে? ভাঁড়ে তো মা ভবানী।

পোস্তর বড়ার মতো একটা তুচ্ছ জিনিস সেটাও এখন প্রায় হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। কী আকাশছোঁয়া দাম পোস্তর।

তবু আজ করে রেখেছিল চায়ের সঙ্গে খাবে বলে। আর তিলের নাড়ু। রাত্রে রুটির বদলে করে রেখেছে পরোটা।

হোক একটু মুদির কাছে ধার ধোর। অরুণ মাইনে পেলে শুধে দেবে লাবু।

চা এনে দিল লাবু ছেলেকে।

লাবুর মনের মধ্যে বিদায় বাঁশীর সুর।

কিন্তু অরুণের নয়।

সে পোস্তর বড়ায় কামড় দিয়েই বলে উঠল. ফাস্ট ক্লাস। এই ছেড়ে আর কোথাও গিয়ে থাকা। অসম্ভব।

লাবু মনে করল কথার কথা। একটু বিষণ্ণ-হাসি হাসল। বলল, ভাল হয়েছে?

পারফেক্ট।

চায়ে চুমুক দিল।

তারপর বলল, ট্রেনে কী ভিড় বাবাঃ। হাজার—কত হাজার যে লোক ডেলি প্যাসেঞ্জারী করে মা। চিঁড়ে চ্যাপ্টা কথাটা এখানে কিছুই নয়।

মা আস্তে বলল, সেই তো। রোজই প্রাণ হাতে করে যাওয়া আসা। সেই জন্যেই তো—

অরুণ তিলের নাড়ুতে কামড় দিয়ে বলল, তো ভেবে দেখলাম এতো লোক যখন পারছে তখন আমারই বা না পারার কী আছে?

তার মানে?

লাবু একটু তীক্ষ্ণ হলো।

অরুণ বলল,—মানে মাকে এভাবে একা ফেলে রেখে মামার বাড়ির আদর খেতে যাওয়া কোনো কাজের কথা নয়। সকলের মতো ওই ডেলি প্যাসেঞ্জারী চালাই। দেখি পারি কিনা।

অরুণ! ছেলেমানুষী করিসনে বাবা। সুবিধে যখন রয়েছে এত কষ্ট কেন করবি? আমার কথা ভাবিসনে। হপ্তায় হপ্তায় তো আসবি। তোর মামাকে কেমন দেখলি তাই বল।

খুব ভালো।

কী বললেন?

কী বলবেন?

না মানে আমার কথা কিছু জিগ্যেস—

ওরে বাবা! সেটাই তো প্রধান প্রসঙ্গ? তোর মা এখনো তেমনি রোগা আছে কিনা। খুব বুড়ো বুড়ো হয়ে গেছে কিনা। এখনো সেই রকম কথা বলে কিনা।

ভারী খুশী হয় লাবু।

তারপর বলে, ছাখ বলেছিলাম কিনা? তোর দাদাদের সঙ্গে দেখা হলো?

দাদাদের সঙ্গে, কই নাতো।

বাড়ি ছিল না বোধহয়। বৌদি ছিল তো?

নাঃ। আর কাউকেই দেখলাম না বাবা। শুধু ভূষণ নাকি নাম একটা কে চা দিয়ে গেল।

ভূষণ! ওমা সে এখনো আছে? বৌদির আমলের লোক। বাড়ি-সুদ্ধ সব গেছে কোথায়? সিনেমা-টিনেমা না কি। তা সে যাই হোক মামাকে বলে এসেছিস তো কালকে একেবারে জিনিসপত্র নিয়ে—

হঠাৎ থেমে গেল। অন্যদিকে তাকাল।

গলাটা ঝাড়ল।

আর অরুণ নামের ছেলেটা বলে উঠল, আমার বলার আগে তিনিই তো বললেন। তো আমি বাপু বলে দিলাম, মা লিখেছেন বটে, কিন্তু এখন ভেবে দেখছি মাকে ওভাবে একা রেখে আসা ঠিক হবে না।

কিন্তু এই কথাই কি বলেছিল অরুণ সেই প্রবাসজীবন নামের মানুষটাকে?

মায়ের কাছে কখনো মিথ্যে কথা বলে না অরুণ। আজ বলল। না বলে উপায় কী?

কী করে বলবে বাড়িতে বাড়ির অন্য সবাই ছিল না। আমাকে দেখে চাকরের সঙ্গে সোজা বাড়ির কর্তার কাছে পৌঁছে দিয়েছিল। আর সেই চাকরটিই খানিক পরে এক কাপ চা আর দুটো ফ্রীজে রাখা ঠাণ্ডা আর শক্ত হয়ে যাওয়া সন্দেশ দিয়ে গেছল। আর কর্তা খোনা গলায় অরুণকে তার মায়ের কথা শুধোতে শুধোতে একসময় খুব গলা নামিয়ে বলেছিলেন, কিছু মনে করিস না বাবা। আমার মনে হচ্ছে তোর বোধহয় এখানে তেমন সুবিধে হবে না। তুই একটা মাঝারি মতো মেস খুঁজে নে। সেই খরচাটা আমি দিয়ে দেব।

হাতটা চেপে ধরেছিলেন করুণভঙ্গীতে।

একথা কী বলা যায়?

এবং বলা যায়, নরানাং মাতুলক্রম গো মা। তাই আমিও তাঁর পদ্ধতিতে গলা নামিয়ে বললাম, ও নিয়ে আপনি মন খারাপ করবেন না মামা। ঠিক আছে ঠিক আছে। আর গলা তুলে বলেছিলাম, মা তো আমার জন্যে ভেবেই অস্থির। কিন্তু আমি ভেবে দেখছি মাকে এভাবে একা ফেলে রেখে আসা ঠিক হবে না। হাজার হাজার লোক ডেলি প্যাসেঞ্জারী করছে ওই লাইনে।

বলা যায় না বলেই মিথ্যে কথা সাজিয়ে বলা।

'মাকে একা রেখে আসা ঠিক হবে না?' এই কথা বলে এলি তুই? অ্যাঁ?

এলাম।

ছি ছি! কী বোকা ছেলে রে তুই। প্রবাসদার ওখানে তোর কতো সুবিধে হতো।

ধ্যেৎ তোমার সুবিধে, সবসময় তোমার জন্যে ভাবনা হতো!

ওমা! কী পাগল ছেলে গো। এই তো ঠিক হয়েছিল রাত্তিরে কানাইয়ের মা এসে শোবে। তাও তো হপ্তায় দুটো রাত্তির তুইই থাকবি।

বাকি পাঁচটা রাত?

তোর মাকে ভূতে খেয়ে ফেলবে?

আশ্চয্যি কী? কুল্যে একটা মাত্তর মা আমার! রিস্ক নেওয়া কী ঠিক?

হঠাৎ লাবুর দুচোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে। আর লাবু তার মধ্যেই হি হি করে হেসে উঠে বলে, আহা তাই তো। লোকেদের কত গোছাগোছা মা থাকে! আর তোর কুল্যে একটা মাত্র মা!

ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরবার মতো আবেগ প্রকাশে অভ্যস্ত নয় লাবু। অথবা লাবুর মতোনরা।

তাই লাবু ছেলের অলক্ষ্যে চোখটা মুছে নিয়ে বলে, তুই একটা

নির্বুদ্ধির রাজা। বড়লোক মামার বাড়িতে ভালমন্দ খেয়ে শরীর সেরে যেত—। লোকাল ট্রেনের ওই ভীড়ের ঠ্যালা সহ্য করতে হতো না।

বোকা মায়ের ছেলে বোকা হবে না তো কি চালাক হবে গো লাবণ্যলেখা দেবী ?

অরুণ হেসে ওঠে।

তোমার হাতের পোস্তর বড়ার থেকে বড়লোকের বাড়ির ভালমন্দটি বেশী ভাল হলো ?

লাবণ্যলেখা নামের চিরবঞ্চিতা চিরদুঃখী মেয়েটার প্রাণটা কানায় কানায় ভরে ওঠে।

আর সেই ভরা ভর্তিটা উপচে উঠে চোখের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসতে চায়।

আর অনেক রাত্রে—

যখন খাওয়াদাওয়ার পর অরুণ তার নিজস্ব জায়গায় শুয়ে পড়ে, তখন পাশের ঘরে এসে নিজের বিছানায় বসে পড়ে ভাবতে থাকে, সত্যি কী বোকা সে! কী বোকা! বুদ্ধির ভুলে কতখানি হারাতে বসেছিল।

* * *

কই তোমার নতুন গেস্টকে তো দেখলাম না!

প্রবাসজীবনের ঘরে এসে সৌম্যজীবন বলে উঠল।

দিব্য বাবাকে 'আপনি' করে বলে। কিন্তু সৌম্য নয়।

ছেলেবেলাতেই বলতো ধ্যেৎ বাবাকে আবার 'আপনি' কী ? অন্যবাড়ির লোক না কী ? তাহলে মাকেও আপনি বলিস না কেন ?

তা এখন ক্রমে ক্রমে নিজেই প্রায় 'অন্যবাড়ির' মতো দুরদুর্লভ হয়ে উঠলেও ডাকটা 'নিকট' আছে।

এ ঘরে এমন করেই বা ঢুকে পড়ে সৌম্য ?

প্রবাসজীবন আজকাল সব কথাতেই যে কেন থতমত খান! এই একটা রোগ হয়েছে তাঁর। হয়তো বা সব সময় স্মৃতির অতলে

তলিয়ে থাকেন বলেই। তাই থতমত খেয়ে বললেন,—নতুন গেস্ট?

বাঃ। ওই যে কার এখানে এসে থেকে অফিস যাবার কথা ছিল শুনেছিলাম।

ওঃ। তোদের লাবু পিসির ছেলে। হ্যাঁ, লাবু সেইরকম একটা চিঠি লিখেছিল বটে। তো ছেলেটা এসে দেখা করে বলল, মাকে একা হুগলীতে রেখে কলকাতায় থাকা, মন চাইছে না।

যাচ্চলে!

সৌম্য বলল, কবে যেন খুব জোর আলোচনা শুনছিলাম, ভাবলাম এসেই গেছে বুঝি। শুনে মনে হলো ভালই হলো। ভাগ্নে টাগ্নেরা তো শুনেছি একটু 'মামা ঘেঁষা' হয়, তোমার একটা গল্প করার লোক হলো।

প্রবাসজীবন আস্তে বললেন, আমার জন্যে এত ভাবিস তুই?

সৌম্য একটু মাথা চুলকোনোর ভঙ্গীতে হেসে বলল, ঠিক ভাবি না। তবে শুনে মনে হয়েছিল। ভেবেছিলাম তোমার এখানে ওই ডিভানটাতে সেই মহাত্মার শোয়ার ব্যবস্থা করে দিলে বেশ সারারাত মামাভাগ্নেয় গালগল্প হতো। আমরা তো কোন কর্মে লাগি না।

প্রবাসজীবন যেন তাঁর ছোট ছেলেটাকে নতুন দেখলেন। একটু অবাক হয়ে তাকালেন। না ব্যস্ত নয়। দাদার মতো সর্বদা ব্যস্তের ভঙ্গী তার আয়ত্ত নয়।

আস্তে বললেন, থাকবে বলেই এসেছিল। আমি বলে দিলাম এখানে তোর সুবিধে হবে না।

সৌম্য বাবার মুখের দিকে তাকাল।

বলল, ও!

প্রবাসজীবন কখনো যা না বলেন তাই বলে বসলেন।

বললেন, বোস না একটু।

সৌম্য অবশ্য বসল না। তবে খাটের কাছে সরে এলো।

প্রবাসজীবন গাঢ় গলায় বললেন, তোরা তো 'অধিকার' নিয়ে

অনেক সব চিন্তা ভাবনা করিস। আফ্রিকায় কী হচ্ছে তা নিয়েও ভাবিস। আচ্ছা বল দিকি, কোন অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে মানুষের সবচেয়ে কষ্ট!

সৌম্য বলল, ঠিক কোন পয়েণ্টে বলছ কথাটা ঠিক বুঝলাম না।

বুঝবিও না। আমার মতে সব থেকে দুঃখ, কারো প্রতি স্নেহ প্রকাশের অধিকার হারানো। ন্যায্য অন্যায্য কথা বলবার অধিকার হারানো।

সৌম্য খাটের ধারে বসল। বাপের মুখের দিকে একটু তাকিয়ে বলল, এই হারানোটার কারণ অহেতুক ভয়।

প্রবাসজীবনের সাধ হয় হাত বাড়িয়ে ছেলের খাটের ওপর রাখা হাতটায় একটু হাত রাখেন। কিন্তু অনভ্যাসের জন্যে পেরে ওঠেন না।

কিংবা শুধুই অনভ্যাসের জন্যেও নয় এখানেও কাজ করছে সেই ভয়। সৌম্য যদি ভেবে বসে একটু প্রশ্রয় পেলেই মানুষ অনেকটা চেয়ে বসে। হাতের ওপর হাতটা রাখলেন না। বিছানায় বুলোতে বুলোতে বললেন, হয়তো তাই। তবে ভয়কে জয় করতে চাইলেই যে এক মুহূর্তে পরিবেশ বদলে যাবে। সংসারের চেহারা বদলে যাবে। হয়তো আগুন জ্বলে উঠবে।

সৌম্য হেসে ফেলে বলে, এও আর একরকম ভয়।

প্রবাসজীবন হতাশ হয়ে বললেন, যারা কেলেঙ্কারীকে ভয় পায় না, তাদের সঙ্গে বড় বেশী সামলে চলতে হয় রে সৌম্য।

হুঁ।

সৌম্য উঠে পড়ে।

ঘরের চারদিকে চোখ বুলোয়।

বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

*　　*　　*

কী অরুণদা কী হলো? রোজই দেখছি ভোরবেলা ট্রেন ধরতে ছুটছো, আর রাত্তির বেলা ঘষটাতে ঘষটাতে ফিরছো। তোমার

কলকাতার কী হলো? বাবুকে তো ধরতেই পারা যায় না। আজ রবিবার বলেই—

অরুণের জানা ছিল না 'রবিবার' শব্দটা এত মনোরম। সকালে উঠে যখন মনে পড়ল আজ রবিবার তখন যেন আকাশের রংই বদলে গেল। চা খেয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। যদিও এখনি রোদ বেশ চড়া হয়ে উঠেছে। রোদের মধ্যেই মিণ্টুও বেরিয়েছে!

অরুণের মনে হলো মিণ্টুকেও যেন নতুন দেখল। আর মনোরম মনে হলো।

অরুণ বলল, আমি কলকাতা গিয়ে না থাকায় তোর কোন অসুবিধে হচ্ছে?

ওমা! হচ্ছে না আবার। তুবেলা জানালায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার গতিবিধির হিসেব রাখায় কম সময় বাজে খরচ হয়?

তাই না কি? তো এই হিসেবরক্ষকের চাকরীটা তোকে কে দিল শুনি?

ওরে বাবা! ফাঁস করে ফেলি আর তুমি আমার চাকরীটা খেয়ে দাও। না না!

আমার সম্পর্কে তো তোর বেশ উঁচু ধারণা দেখছি। তো তোর না সামনেই পরীক্ষা? এভাবে পড়া কামাই করে রাস্তায় টো টো করছিস যে।

রাতদিন পড়ে পড়ে বই মুখস্থ করলেই কি ফার্স্ট সেকেণ্ড হব?

আরেব্বাস। একেবারে 'ফার্স্ট সেকেণ্ড'। ভাল করে পড়লে একটু ভাল নম্বর তো পাবি?

সেটুকু পেয়ে লাভ?

কী আশ্চর্য! পাওয়াটাই তো লাভ। আরো বেশী পড়াশুনা করতে ইচ্ছে হলে—

মিণ্টু উদাসভাবে বলে, আমাদের মতো মেয়েদের লাভ লোকসান ছেলেদের লাভ লোকসানের হিসেবে চলে না অরুণদা। আমাদের পড়াশুনোর লক্ষ্য তো আরো বেশী পড়া নয়। লক্ষ্য মাত্রা হচ্ছে

একটি শাঁসালো পাত্র। কোনোমতে গ্র্যাজুয়েটটা হতে পারলেই বাবা তেমন একখানা শাঁসালোর চেষ্টায় উঠে পড়ে লাগবে।

অরুণ এদিক ওদিক তাকালো। যদিও এখন বেশ রোদ তবু এখানে 'বুড়ো শিবতলার মন্দিরটা'র একটু ছায়া পড়েছে। মন্দিরের দরজা এখনো বন্ধ। বুড়ো পুরুত নিতাই ভটচায্ বেলা নটার আগে স্নান সেরে মন্দির খুলতে আসতে পেরে ওঠেন না! লোকে বলে তার আগে তাঁর গাঁজার খোঁয়াড়ি ভাঙে না।

খবরটা সবাইয়ের জানা। কাজেই 'বাবার মাথায়' পুজো চড়াতে আসা লোকেরা ওই একপ্রহর বেলা পার করেই আসে। আর যে ভক্তদের বাবার মাথা পর্যন্ত এগোবার চেষ্টা নেই তারা বাবার চৌকাঠেই নিজের মাথাটা একবার ঠুকে চলে যায়। এখন আপাতত কোনো ভক্ত উপস্থিত নেই।

অরুণ যে কেন কথা বলতে বলতে এদিকে চলে এলো কে জানে। অবশ্য বিশেষ কোন গন্তব্য তার ছিল না। এমনিই বেরিয়েছিল। কিন্তু মিণ্টই বা কোন লক্ষ্যে বেরিয়েছিল? হয়তো অরুণদের বাড়ির উদ্দেশ্যেই—। কারণ একটা উদ্ভাবন করা তো শক্ত নয়

পাড়াতুতো কাকী লাবণ্যলেখার কাছে গিয়ে বললেই হলো, ভালো কাকীমা আপনার বাড়িতে গাঁদাল পাতার গাছগুলো এখনো আছে? বাবার পেটটা একটু ইয়ে হয়েছে। মানে ভাল নেই।

মিণ্টুর বাবার বারো মাসই পেটটা ভাল না থাকার ধাত। কাজেই মিণ্টু যদি বিনা নির্দেশে বাবার জন্যে 'পথ্য' আহরণ করে নিয়ে যায় মা-বাবা দুজনেই মেয়ের পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখে মোহিত হবে। এবং এই এতক্ষণ বাড়ির বাইরে থাকার একটা যুক্তিও দেখানো যাবে।

কিন্তু পথেই তো দেখা হয়ে গেল।

আর দুজনেই কেমন যেন 'অন্যমনা' ভাবেই 'পথ' ছেড়ে মাঠ ভেঙে পথের প্রান্তে এসে পেঁীছে গেল।

হয়তো এর পিছনেও একটা চতুরবুদ্ধি কাজ করছিল। মন্দিরের

কাছে বরাবর এসে গেলে কারণ দেখানো যাবে বুড়ো শিবকে প্রণাম করতে আসা।

যদিও অরুণকে কখনো বুড়োশিব সম্পর্কে এমন ভক্তিমান বলে দেখা যায়নি। কিন্তু নতুন চাকরী হয়েছে, এখন তো একটু কৃতজ্ঞতা থাকতেও পারে।

মিণ্টুর কথা স্বতন্ত্র। মিণ্টুকে তো তার মা ছেলেবেলা থেকেই শিবের মাথায় জল দেওয়ার শিক্ষা দিয়ে আসছে শিবের মতো বর পাওয়ার আকাঙ্খায়।

পৃথিবী নাকি এখন 'নারীমুক্তি' আন্দোলনে সোচ্চার। দিকে দিকে সমান অধিকার অর্জনের লড়াই। যুগ যুগ ধরে অবোধ অজ্ঞান নারীজাতি কী ভাবে শোষিত হয়ে আসছে তাই নিয়ে তীব্রতা এবং সমাজ কেন এখনো পুরুষ শাসিত থাকবে সেই প্রশ্নে উত্তাল। অথচ পৃথিবীর কোটি কোটি মেয়ে এখনো জানে, তার জীবনের পরম চরিতার্থতা একটি ভাল বর পাওয়া। একটি ভাল ঘর পাওয়া। সেইভাবেই ভাবিত হয়ে আসছে তাদের অভিভাবকরাও। পরম আদরের মেয়েটিকে কী করে উপযুক্ত ভাবে গড়ে তুলে আর এক ঘরে পাঠাতে পারবে।

'ভাল বর' 'ভাল ঘর', তেমন আর ক'জনের ভাগ্যেই বা জোটে? তবু চেষ্টাটা তো থাকে! সেই চেষ্টার একটা ধাপ হচ্ছে শিবের কাছে প্রার্থনা। তবে ঘরহীন ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলে সিদ্ধিখোর শিবঠাকুরটির কাছেই কেন তার মতো বর পাওয়ার প্রার্থনা বাঙালী মনের এ এক রহস্য!

তবে আপাততঃ একটা ছেলে আর একটা মেয়ে যে কোন হৃদয় রহস্যে দেখা হওয়া মাত্র একটু বেশীক্ষণ কাছাকাছি থাকতে পাওয়ার উপায় উদ্ভাবন করতে তৎপর হলো সেটা হয়তো জগতের তরুণ হৃদয়েরই শুধু জানা।

আশ্চর্য। একই পাড়ার ছেলেমেয়ে। জ্ঞানাবধি কেন জন্মাবধিই দেখে আসছে। তবু হঠাৎ কখন কোন অবকাশে কোন রহস্যে সেই

দেখা হওয়াটাই এমন মহামূল্যবান হয়ে উঠল। অবশ্য ব্যাপারটা নতুন কিছু না। গোয়ালার জোলো দুধের মতো চিরকালীন এই 'বাল্যপ্রেম' নিয়ে অনেক অনেক জোলো কাহিনী লেখা হয়ে গেছে ইতিপূর্বে। তবু। ভোরের আকাশ তো রোজই সুন্দর। গোধূলি-বেলার আলো রোজই মনোরম।

অরুণ এদিক ওদিক তাকালো। তারপর বলল, 'অর্থাৎ হে বালিকা তুমি হচ্ছ বলির জন্য উৎসর্গীকৃত ছাগপশুমাত্র।'

মিণ্টু ভারী গলায় বলল, তাছাড়া আর কী?

—শেম। শেম। আজকাল এই নারীমুক্তির যুগে এই কথা বলছিস?

—যা সত্যি, তা স্বীকার করবার সৎসাহস আছে বলেই বলছি।

অরুণ বলে উঠল, ধ্যাৎ! সক্কালবেলা মনটা স্যাঁৎসেতে করে দিসনি। ভাল কথা বল।

—আমার আবার ভাল কথা। বরং তোমারই কিছু নতুন ভাল কথা আছে। নতুন অফিসের কথা।

—আরে ধ্যাৎ! সরকারি শুধু কেরাণীর আবার অফিসের গল্প!

—ওমা সরকারি কেরাণীরাই তো কেবল অফিসের গল্প করে। অফিসই তাদের ধ্যান জ্ঞান।

এই ব্রহ্মজ্ঞানটি তোকে দিল কে?

দিল? তা বলতে পারো আমার ছোটমাসি। ছোটমাসি বলে, কানুছাড়া যেমন গীত নেই। তোর ছোটমেসোর তেমনি অফিসছাড়া কথা নেই।

অরুণ আচমকা প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলে ওঠে, তোকে এই শাড়িটায় দারুণ দেখতে লাগছে।

মিণ্টু চমকে ওঠে।

ঠিক এ ধরনের কথা কোনোদিন বলে বসেনি অরুণ। এ কী প্রেম নিবেদন? না এমনি সহজ কথা মাত্র? ছেলেবেলা থেকেই পরস্পরের মধ্যে যেন কেমন একটা বন্ধন-সূত্র রচিত হয়ে আছে। ওরা জানে

'ওর' সঙ্গে কথা বলার সময় সৌজন্য রেখে ভেবেচিন্তে কিছু বলা দরকার নেই। যা খুশী বললেও পার পেয়ে যাওয়া যাবে। এ যেন পরস্পরের মধ্যে একটা অলিখিত চুক্তি।

মিণ্টুর মুখটা লাল হয়ে উঠল। মিণ্টু থতমত খেল। তবে তৎক্ষণাৎ সামলে নিয়ে বলল, আহা কী একখানা শাড়ি।

—শাড়িটা দারুণ তা তো বলিনি। তোকে দারুণ দেখাচ্ছে তাই বলছি।

—ঠিক আছে। এ প্রসঙ্গ থামাও।

গলার স্বর নিচু করল মিণ্টু। চোখের ইঙ্গিতে দেখাল পূজারী আসছেন। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে।

অরুণ তাড়াতাড়ি বলল, আমি সরে পড়ছি। বুড়োর চোখে ছানি পড়লে কী হবে, 'দৃষ্টি' বেশ তীক্ষ্ণ।

* * * *

লাবু বলল, ওমা গাঁদাল পাতা? নে না কত নিবি। গাদা গাদা জন্মেছে। জঙ্গল বনে গেছে।

পাতা সংগ্রহ করে একটা ঠোঙায় ভরে নিয়ে [illegible] লাবুর দাওয়ার ধারে পা ঝুলিয়ে বসে এটা ওটা আলটু বালটু কথা কয়ে উঠতে যাচ্ছে, খোলা দরজা দিয়ে অরুণ ঢুকল।

বলল, কী রে কী খবর?

লাবু তাড়াতাড়ি বলল, এই যে বাবার জন্যে গাঁদাল পাতা নিতে এসেছে। বারোমাস ডিসপেপসিয়ার রুগী মানুষটি।

অরুণ বলল, বেশী কিছু বেড়েছে নাকি?

মিণ্টু উঠে দাঁড়াল।

তার সেই জাফরানি রঙা শাড়ির আঁচলটা একটু গুছিয়ে নিল। তারপর বলল, নাঃ। নতুন কিছু না। হঠাৎ মনে পড়ল এই ঝোলটায় বাবা ভাল থাকে।

জ্যেঠিমা ভাল আছেন?

হ্যাঁ।

আচ্ছা বলিস, পারি তো ওবেলা যাব। রেলের একটা মান্থলি টিকিট করাতে হবে জ্যেঠু যদি—

যদিটা আর শুনল না মিন্টু। বলল, আচ্ছা বলে রাখব। দৌড় দিল জোর পায়ে। তবু এইটুকুর মধ্যেই দুজনে দুজনের দিকে একটা চকিত দৃষ্টিপাত করে গেল।

* * * *

প্রকৃতির রাজ্যে অনেক নামী দামী গাছের সমারোহ। তবু নামহীন দামহীন ছোটছোট গাছেরাও তো টিকে থাকে। আর এরাই হয়তো এই বিশ্বভুবনের মাটি সরস রাখে। সবুজ রাখে পরিবেশ।

ওদের একটা 'সংগঠন' আছে। সেই বাবদ একটা ঘরও আছে। ঘরটা ওদের দীক্ষাদাতা ভবেশদার।

ভবেশদার সংসারে 'চুলো' নেই বটে তবে 'চাল' একটা আছে। পৈত্রিকসূত্রে পাওয়া। যদিও ভবেশ ভৌমিক এই সব পৈত্রিক ধন টন সম্পর্কিত আইনের ঘোরতর বিরোধী। তথাপি বাড়িটা ছেড়ে দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ার ইচ্ছেটা বরাবর মুলতুবিই রয়ে গেছে। ছোট্ট বাড়ি। নেহাৎই ছোট্ট। তার একখানা ঘরে নিজে থাকে আর একখানায় ছেলেরা এসে জমায়েৎ হয়। ভাল ভাল আর বড় বড় কথা হয়। মেয়েও আসে দু একটা।

ভবেশের বাড়িতে এক পেয়ালা চাও জোটে না। ভবেশ নিজে কোনো একটা সস্তার হোটেলে খেয়ে আসে। এবং সামনের চায়ের-দোকানের সঙ্গে বন্দোবস্ত আছে। দোকানের একটা ছেলে একহাতে একটা হাড়ে মজ্জায় কালিমাখা পোড়া কেটলিতে গরম চা আর অন্যহাতে কয়েকটা ক্ষুদে ক্ষুদে মাটির ভাঁড় নিয়ে আসে।

ভবেশ একা থাকলে একটা ভাঁড়ই কাজে লাগে। তবে কেউ উপস্থিত থাকলে সেইমত কাজে লাগে। বিকেলে কেউ না কেউ থাকেই। তবে বুধবার আর শুক্রবারে সন্ধ্যার সময় বেশ কিছুজন জমায়েত হয়। কেটলির চা সব ফুরোয়। হয়তো আরও একবার

আনতে যেতে হয় ছেলেটাকে।

তবে এ কথা মনে করবার হেতু নেই যে ভবেশ এদের 'গেস্ট'-এর মর্যাদা দেয়।

ভবেশের নীতি হচ্ছে 'ফেলো কড়ি মাখো তেল'।

এদের সংগঠনের' লক্ষ্য হচ্ছে দেশ থেকে শিশু শ্রমিকপ্রথার' অবসান ঘটানো।

একদা ভবেশ কিছুটা উচ্চমানের রাজনীতি করেছে। এখন সেখান থেকে সরে এসেছে। এখন যাতে মনপ্রাণ নিয়োগ করেছে এবং তার নিজস্ব কিছু 'ভক্ত' ছেলেকে একজোট করেছে, একে রাজনীতি বলো তো রাজনীতি, হৃদয়নীতি বলো তো হৃদয়নীতি।

সমাজে শেকড়গাড়া একটা আমানবিক কুপ্রথা দূর করবার চেষ্টা করতে হলে প্রথমেই তো দরকার 'হৃদয়'।

অতঃপর আইন প্রণয়নের জন্যে লড়ালড়ি।

কিন্তু এক্ষেত্রে তো লড়ালড়ির দরকার নেই। আইন তো আছেই।

অনেকদিন আগেই তো 'শিশুশ্রম' বেআইনী হয়ে গেছে। যেমন হয়ে গেছে 'পণপ্রথা'।

সমাজের বহুবিধ শেকড়গাড়া কুপ্রথার উচ্ছেদ কল্পে অনেক আইনই গড়া হয়েছে। কিন্তু গড়াই হয়েছে, কার্যকরী হয়েছে কী?

সংগঠনের দরকার সেই কার্যকরীটি করানোর জন্যে।

ভবেশ বলেছিল, প্রথম কাজ হবে চেতনা জাগানো। না, যারা খাটায় শুধু তাদের মধ্যেই নয়, যারা খাটে তাদের মা বাপ কী অভিভাবকদের মধ্যেও।

কিন্তু মা বাপই বা ক'জনের আছে?

যারা রেল লাইনের ধারে কয়লার ঘেঁষ তুলতে গিয়ে ঘেঁষ চাপা পড়ে মরে যারা চুরি করে মাটি কাটতে গিয়ে নিজের কাটা খাদে তলিয়ে গিয়ে মরে, যারা কলে কারখানায় সিকি পারিশ্রমিকে একটা পুরো মানুষের শ্রমদান করতে করতে ক্রমশই অনাহার অপুষ্টিতে ধুঁকতে ধুঁকতে মরে, তাদের কী মা বাপ থাকে?

আর যারা 'অভিভাবক' সাজে ?

তারা তো এই পাপচক্রের দালাল।

তারা অসহায় অনাথ ছেলেমেয়েগুলোকে খেতে দেবার আর পয়সা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে খাটাতে নিয়ে যায়, তারা তাদের হাত মুচড়ে সব পয়সা কেড়ে নিয়ে মুষ্টি ভিক্ষা দিয়ে বিদেয় দেয়।

তবু তারা ছাড়াও তো গতি নেই হতভাগ্য বেচারাদের।

এদের উদ্ধারের পথ আবিষ্কারের চিন্তা আর পরিকল্পনা ভবেশের।

অর্থাৎ হাত দিয়ে হাতী ঠেলার চিন্তা।

চামচ ডুবিয়ে সমুদ্র মাপার।

তবু এই ভাবেই ভবিষ্যতে একদিন কাজ হয়।

হয়তো এক যুগে নয়, একাধিক যুগে।

তবে মা বাপ আছে এমন শিশু শ্রমিকই কী নেই? হাজারে হাজারে আছে। মা বাপই তাদেরকে পাঁচ বছর না হতেই কিছু না কিছু কাজে লাগিয়ে দেয় তার 'নিজের ভাত' নিজে যোগাড় করানোর মহৎ নীতিতে।

কিছু না হোক, ক্ষুদে মেয়েটা মায়ের সঙ্গে এসে বাসন মাজায় হাত লাগিযে মায়ের কাজের সুসার করে দেয়, যাতে মা আরো দুখানা বাড়ি বাসনমাজার কাজ ধরতে পারে।

আর ছেলে বাচ্চাগুলো?

সেও দেখা যাবে হরিণঘাটার দুধের গাড়ি এলে বুথে বুথে। পাঁচ কেন হয়তো বা চার বছরের ছেলেটাই একহাতে বোতাম ছেঁড়া হাফপ্যান্টের সামনেটা মুঠোয় চেপে ধরে আর একহাতে দুধের বোতল বসানো লোহার খাঁচাখানা অথবা গোটাকতক দুধের বোতল বসানো জালি থলিটাকে বাগিয়ে ধরে প্রায় মাটিতে ঘষটাতে ঘষটাতে বাবুদের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছে বোতল। বোতল পিছু মাসিক একটা রেট ধার্য করা আছে। এরা আর দুটো বছর গেলেই চায়ের দোকানে কী খাবারের দোকানে।

এদের মা বাপের মধ্যেই তো চেতনা এনে দিতে হবে।

এদের মধ্যে চেতনা আনা? দূর অস্ত। বুঝলেন ভবেশদা।

ঘরের মধ্যেকার একমাত্র আসন অথবা আসবাব কেঠো দুখানা চৌকি পাশাপাশি জোড়া দিয়ে পেতে ঢাউশ করে তোলা। ঘরটায় আর পা ফেলবার জায়গা নেই। খোলা দরজা থেকেই চৌকিতে উঠে পড়তে হয় এবং সামনেই দেওয়ালের জানলা দুটো খোলা বন্ধ করার কাজ চৌকিতে উঠে সারতে হয়। আগে মাটিতে মাদুর বিছিয়ে সমাবেশ হতো। কিন্তু মেঝের একটা অসুবিধে কোথা থেকে যেন পিঁপড়েরা চলে আসে সারি বেঁধে, আর মাঝে মাঝেই আরশোলারা উড়ে এসে হাতে পায়ে উঠে পড়ে।

চৌকিতে অবশ্য কোনো আবরণের বালাই নেই। নেহাৎই কাষ্ঠাসন। তো তাতে কিছু এসে যায় না। যারা কোনো 'ভাল কাজ' করতে আসে তারা আরাম নিয়ে মাথা ঘামায় না। বিশেষ করে ভবেশের সামনে।

ভবেশ বলল, জানি। দূরকে কাছে এনে ফেলার এলেম রাখতে হবে।

সৌম্যর সঙ্গে বেরিয়েছিল ব্রততী।

সে বলে উঠল, সর্বত্রই একছাঁচ ভবেশদা। বাপ-টাপ যদি থাকেও সে না থাকার সামিল। হয় রোজগারে নারাজ। বৌয়ের রোজগারে বসে খায়, নয় যা রোজগার করে নেশা করে ওড়ায়। এবং ঘরে এসে বৌ ছেলেকে পিটোয়।

ব্রততী একটু থেমে হতাশ গলায় বলল, নতুন কিছুই নয় ভবেশদা। পৃথিবীর তাবৎ দারিদ্র্যের ইতিহাসই তো এই। বেচারা মেয়েগুলো নিজেরা প্রাণপাত খাটে, আর বাচ্চাগুলোকে একটু খাড়া করে তুলতে পারলেই খাটতে পাঠায়।

হাসল একটু ব্রততী।

বলল, মা ষষ্ঠীর কৃপাটিও তো ওদের ওপরই বেশী। সুখী পরিবার গঠনের জন্যে যতই শিক্ষাদীক্ষা দিতে যান, ওরা তার ধারে কাছে ঘেঁষে না।

সৌম্য বলে উঠল, রেল লাইনের ধারে সেই বস্তিটার একটি—কী বলব? মহিলা? না কি স্ত্রীলোক, যাক গে যাই হোক কী বলল, মনে পড়ছে ব্রততী?

কী বলল, বল না ভবেশদাকে।

কী আর বলব? বলতেও হাসি পায়। মাথা ঝাঁকিয়ে ব্রততী বলল, মেয়েলোকটা বলল, আপনাদের তো দিদি কত বল। ধনবল জনবল মনোবল। আমাদের বলভরসা বুকের বল সবই তো ওই ছেলেপেলে। ওরাই আমাদের জনবল। একটু ডাগর হলেই চরে খেতে শিখে যায়। আবার 'মা' বলে টানেও।

আরো কিছু কিছু ইতিহাস শোনায় ব্রততী। সবই একরঙা। বিবর্ণ হলুদ একটা মৃত্যুর রং।

ওরই মধ্যে কোনো কোনো মা এও বলল, ইস্কুলে মাইনে লাগে না, বই শেলেট দেয়। ভর্তি করে দেখলাম ছেলে দুটোকে। লেখাপড়ায় মন নাই। ইস্কুলে যাওয়ার নাম করে বেরিয়ে পথে খেলিয়ে বেড়ায়। তো আর কী করব? একটাকে খাবারের দোকানে দিয়ে দিয়েচি। আর একটাকে বাবুদের বাড়ি ফরমাস খাটতে দিয়েচি। আর একটুক ডাগর হলেই রেক্সা চালাবে।

মেয়েগুলো?

সে তো এ যুগের এক নতুন অবদান। ফ্রক পরা 'কাজের মেয়ে'। বাবুদের বাড়িতে ভর্তি করে দেয় মা। বাবুরা পরম সন্তোষেই গ্রহণ করে। কারণ এমন গরু, খায় কম দুধ দেয় বেশী। বাড়ি ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াবে বলে ভাল ভাল জামা-টামা সাপ্লাই করা হয় তাকে। এবং নিজেও সে বৌদিমণির প্রসাধন দ্রব্যে একটু আধটু হানা দিতে ছাড়ে না। 'দাঁড়া আয়নার' সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে মোহিত হয়। মনের মধ্যে এক মধুর স্বপ্ন গড়ে তোলে। যে স্বপ্ন বৌদিমণির জীবনের ছায়ায় সমৃদ্ধ।

কিন্তু মেয়ের বাড় কলাগাছের বাড়, এই অমোঘ নিয়মে ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরতে বেশীদিন লাগে না।

তখন তার মা ধরে নিয়ে গিয়ে নিজের মাথা বিকিয়ে একটা 'বে' দেয়। ওরাও তো পণপ্রথার শিকার।

অতঃপর মেয়েটা তার মায়ের জীবনের ধারা অনুসরণ করে চলে। অথবা যদি তার স্বপ্নটি বেশী জোরালো হয়, মায়ের কবলে পড়ার আগেই অন্য কারো কবলে পড়ে আর এক ইতিহাস রচনা করে।

কিন্তু সেও তো নতুন কিছু না। মেয়েমানুষের চিরন্তন ইতিহাস।

এদের জীবনকে সুন্দর করে তোলবার স্বপ্ন দেখছে ভবেশ নামের লোকটা। যেমন স্বপ্ন আদি অন্তকাল থেকে দেখেও আসছে এই ভবেশরা।

আরও কিছু মানবকল্যাণকামী হৃদয় এগিয়ে আসে তাদের কাছে। হয়তো বা খানিকটা আপন প্রেরণায় খানিকটা বা নেতার আকর্ষণী শক্তির মোহে। কারণ সেই নেতা হাত দিয়ে হাতী ধরার স্বপ্ন দেখে।

এই কাদাখোঁচা চেহারার ভবেশদার আকর্ষণে গোটা কতক ছেলে মেয়েও তো এসে জুটেছে।

পোড়া কেটলী আর মাটির ভাঁড় হাতে চায়ের দোকানের ছেলেটা এসে দাঁড়াল।

সকলেই হাত বাড়াল।

এবং আপন আপন পকেটে বটুয়ায় হাত দিল।

এখানে 'সৌজন্য'র আইন নেই। ভালবেসে কেউ কারো চায়ের দাম মেটাতে পারবে না।

ভবেশ বলল, আর একটা স্কীম করছি বুঝলি? পাকাপাকি করে ফেলতে পারলে তোদের বোঝাবো। আমার মনে হয় ওতে কাজ আরো সহজ হবে। শীগগিরও হবে।

করবী নামের একটা মেয়ে বলে উঠল, কিন্তু ভবেশদা কাজে বেরিয়ে মনে হচ্ছে এ যেন নখের আঁচড়ে আঁচড়ে পাহাড় ভাঙার চেষ্টা। দরকার সেই ডিনামাইটের। যাতে পাহাড়কে গুঁড়িয়ে উড়িয়ে দেওয়া যায়।

তাই বুঝি?

ভবেশের মুখে একটি ব্যঙ্গ হাসি ফুটে ওঠে। আর তারপরই স্বভাবগত খিঁচিয়ে ওঠার ভঙ্গীতে বলে ওঠে সে, তো ডিনামাইটের সম্বল যখন নেই, তখন আর মিথ্যে কেন পাহাড় আঁচড়ে নখ খোয়াবি। বাবা, সরে পড়। ঘরে গিয়ে একখানা সুপাত্তর বাগিয়ে গাঁটছড়া বেঁধে পতিগৃহে যাত্রা করগে। কাল থেকে আর আসবি না। চৌকাঠ ডিঙোতে এলে ঠ্যাঙ ভাঙবো।

হ্যাঁ। এইরকমই কথাবার্তা ভবেশের।

দূর হ বেরো। আর আসবি না। এই রাস্তা দিয়ে হাঁটবি না ইত্যাদি ইত্যাদি।

তবু ওই একগোছা ছেলেমেয়ে আবারও আসে, বসে, কাজের ভার নেয়। এবং নিজের নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে মাটির ভাঁড়ে পোড়া কেটলীর চা খেতে খেতে পূর্ব পূর্ব কাজের রিপোর্ট দেয়।

এই ভাবেই চলে আসছে।

ভবেশ ভৌমিক নামের লোকটার এই শ্রীহীন সম্বলহীন ছন্নছাড়া চেহারার ঘরটা যেন এক অমোঘ আকর্ষণে এদের এখানে টেনে নিয়ে আসে।

কিন্তু কত দিন নিয়ে আসবে।

নীল নির্মল আকাশে একখানা কালো মেঘের ছায়া পড়েছে যে।

ভবেশ তাকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে চায়। কিন্তু দিতে চাইলেই কী দেওয়া যায়?

*   *   *   *

কথাটা শুনেই চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে চলকে গেলো দিব্যজীবনের। বলে উঠল, মাই, গড। বল কী অ্যাঁ।

চৈতালী অগ্রাহ্যের ভঙ্গীতে বলল, এতে এত অবাক হবার কী আছে? এমন ঘটনা জীবনে এই প্রথম শুনলে বুঝি?

বৌয়ের এরকম 'ঝঙ্কারি' প্রশ্ন দেখলেই দিব্য কেমন গুটিয়ে যায়। এখনো গেল। অথচ প্রশ্নের উত্তর না দিয়েও তো পারা যায় না। তাই অপ্রতিভ হাস্যে বলল, না মানে সে তো আকছারই হচ্ছে। তবে

তোমার কঙ্কণাদির ব্যাপার বলেই। উনি তো না কি বাড়িতে একটা বিপ্লব ঘটিয়ে তোলপাড় করে প্রেমিক পুরুষটির গলায় মালা দিয়েছিলেন।

হ্যাঁ, দিয়েছিলেন। আমার কাছেই শুনেছ। তো কোনো একসময় গলায় মালা দিয়েছিলেন বলেই কি যাবজ্জীবেৎ তার গলা ধরে ঝুলে থাকতে হবে?

ইয়ে তা বটে। তবে পাঁচজনে কী বলবে তাই আর কী। এমনি বিয়ে হয় সে আলাদা!

বলবে আবার কী?

চৈতালী আবার ঝঙ্কার তোলে, আর বললেই বা গায়ে মাখছে কে। ডিভোর্স তো আজকাল একটা স্ট্যাটাস সিম্বল।

দিব্যর মুখটা অজ্ঞাতসারেই একটু হাঁ হয়ে যায়। ডিভোর্স একটা স্ট্যাটাস সিম্বল?

নিশ্চয়! চিরকাল এক খোঁটায় বাঁধা হয়ে সুখের জাবর কাটতে হবেই এমন কোনো কথা আছে? প্রত্যেকেরই একটা ব্যক্তিসত্তা আছে। ডিভোর্স সেটাই প্রমাণ করে।

দিব্যর মনে হলো কথাগুলো বোধহয় চৈতালী এখনই তার কঙ্কণাদির কাছ থেকে শুনে এসেছে।

মাসতুতো দিদি কঙ্কণাদিটিই তো চৈতালীর আদর্শ! কঙ্কণাদির প্রতিটি আচার আচরণ চৈতালীর কাছে অনুকরণীয়। কঙ্কণাদির বেপরোয়া বাকভঙ্গী, অবাধ উন্মুক্ত প্রেমলীলা, কঙ্কণাদির জীবন-যাত্রার বিশেষ ভঙ্গীটি, সবই চৈতালীর কাছে বিস্ময়কর আর আকর্ষণীয়।

আর কঙ্কণাদির বর?

সেও তো কিছু কম ছিল না।

মোটের মাথায় চৈতালীকে তার সেই কোন কালে মা বাপের ঘটিয়ে দেওয়া বিয়ে আর এই কূপমণ্ডুক শ্বশুরবাড়ি ভিতরে ভিতরে একটি হীনমন্যতায় ভোগায়।

বিশেষ করে কঙ্কণাদির সংস্পর্শে এলেই! তবে কঙ্কণাদির মহিমায় মুগ্ধ চৈতালী ক্রমশঃ বরের কাছে আর ওদের নতুন মহিমার কথা শোনাতে পারছিল না। সবই প্রায় পুরনো হয়ে আসছিল।

কঙ্কণাদি সন্ধ্যাবেলায় বরের আর বরের বন্ধুদের সঙ্গে বসে চা কফির মতোই অবলীলায় ড্রিঙ্ক করে। কঙ্কণাদি লোকনিন্দেকে থোড়াই কেয়ার করে। কঙ্কণাদি নিজে গাড়ি হাঁকিয়ে বরের বন্ধুকে নিয়ে টাটা তোপচাঁচি ঘুরে আসে।···কঙ্কণাদি কোনো কুসংস্কারের ধার ধারে না।···কঙ্কণাদি তার একটা মাত্র ছেলেকেও পাঁচ বছর বয়েস হতেই বোর্ডিঙে রেখে মানুষ করছে, ছেলে পাছে ঘরকুনো হয়ে যায় বলে। এ সব তো অনেকবারই হয়ে গেছে।

এখন এই একটা নতুন খবর শোনাতে পেরে বেশ গৌরব বোধ করল চৈতালী।

কিন্তু চৈতালীর বরটি তো এই গাঁইয়া বাড়ির ছেলে। তাই গাঁইয়ার মতোই বলে বসল, দেখো বাবা। সব বিষয়ে তো কঙ্কণাদিকে ফলো করতে ভালোবাসো, এ ব্যাপারে যেন—'ডিভোর্স হচ্ছে একটা স্ট্যাটাস সিম্বল।' ওরে বাবা।

চৈতালী ভুরু কুঁচকে ঠোঁটের রেখায় বঙ্কিম হাসির আভাস এনে বলল, 'স্ট্যাটাস' বলে একটা কিছু থাকলে তো তার সিম্বল? না, ভয়ে কাতর হবার কিছু নেই। হুঁ, একখানা গাড়ির অভাবে আজ পর্যন্ত গাড়ি চালানোটাই শিখতে পেলাম না। অথচ স্টীয়ারিংটা একবার হাতে পেলেই—জামাইবাবু কখনো কখনো অফার করেছে। কিন্তু কঙ্কণাদি হাত দিতে দেয়নি। বলেছে খবরদার। অ্যাকসিডেন্ট ঘটালে সবাইকে মরতে হবে।

একটু থেমে আর একটু অবজ্ঞার হাসি হেসে বলে, কী বাড়িই ছিল তোমাদের আহা! নিজের চেষ্টায় তবু একটু ভদ্রমত করে নিয়েছি তাই।

দিব্যর চোখের সামনে হঠাৎ তালতলা লেনের একখানা পুরনো বাড়ির ছবি ভেসে উঠল। একদা বোধহয় একটা বৃহৎ একান্নবর্তী

পরিবার ছিল। এখন অনেকগুলো পার্টিশানে বিভক্ত নেহাৎই 'এক অন্নর' রান্নাঘর নিয়ে টুকরো টুকরো ক'টি পরিবার।

মাঝে মধ্যে যখন চৈতালীকে নিয়ে দিব্যকে সেখানে গিয়ে বসতে হয়, ওর মধ্যে একটা টুকরোয় ঢুকে পড়ে।

কিন্তু এই ছবিটার কথা কি বলে ওঠা যায়? পুরুষ জাতটা যত বোকাই হোক এত বোকা নয়। সে গাছের যে ডালে বসেছে, সেই ডালের গোড়ায় কোপ মেরে বসে না। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে জয়ী হবার শখ তার নেই।

প্রসঙ্গ পাল্টালো দিব্য।

ডিভোর্সটা পাকাপাকিই হয়ে গেছে নাকি?

এক্ষুণি? তোমার মতো বুদ্ধিমানের পক্ষে এর বেশী আর কী ভাবা সম্ভব? এই তো সবে কেস ঠুকল কঙ্কণাদি।

ওঃ। তাই বুঝি। তা এখন তাহলে বাপের বাড়িতেই?

বাপের বাড়িতে!

চৈতালী বলে ওঠে, ওই বাপের বাড়িতে বসে এসব হয়? কঙ্কণাদির মা তো আমারই মায়ের বোন। দুজনেই এক একটি 'ঘটি'! ও চলে গেছে ওর এক অ্যাড্ভোকেট বান্ধবীর বাড়ি। তার কাছেই সাহায্য সহায়তা পাবে।

বান্ধবীর স্বামী অ্যাড্ভোকেট?

কী আশ্চর্য! এখানে আবার স্বামীর কথা আসছে কোথা থেকে? কেন কোনো মেয়ে অ্যাড্ভোকেট হয় না।

কী আশ্চর্য! হয় না মানে? হাইকোর্টের জজই হচ্ছে।

হুঁ! সে এক আনম্যারেড্ মহিলা। স্বাধীনভাবে এক একটা ফ্ল্যাটে থাকে। কঙ্কণাদির একদার সহপাঠিনী!

দিব্য আর কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে বলে, ও। তাহলে তো ভাল।

দিব্যর আবার এখন চোখের সামনে আর একটি ছবি ভেসে ওঠে। মাসতুতো শালী কঙ্কণার অতি সাজানো গোছানো সুন্দর ফ্ল্যাটটি।

আর তার মধ্যে বিচরণশীল সর্বদা নিজেকে বিকশিত করে তোলার আর্টে সুদক্ষ গৃহিণী, এবং তার বশংবদ স্বামী। লোকটা নাকি একটা মস্ত অফিসের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। কিন্তু বাড়িতে? কঙ্কণার ক্রীতদাস বললেই হয়। তবু কঙ্কণা সে-ঘর পরিত্যাগ করে বান্ধবীর আশ্রয় নিতে গেছে।

অঙ্ক মেলাতে পারে না।

দিব্য মনে মনে নিজেকে গাঁইয়া বলেই মেনে নেয়।

অনেকদিন পরে হঠাৎ মায়ের কথা মনে পড়ে গেল দিব্যর। আচ্ছা মা সর্বদা এত উল্লাসে থাকত কী কারণে? দিব্যরা যখন ছোট ছিল তখন তো তারা একটা ছোট মতো ভাড়াটে বাড়িতে থাকতো। বাবা বাড়ি বানাবার জন্যে টাকা জমাচ্ছে বলে নাকি সব দিকে ছাঁটাইয়ের কাঁচি। খুব সাধারণ জামাটামা পরে স্কুলে যেত তারা দুই ভাই। যদিও বয়েসের তফাৎ অনেকটাই দুজনের মধ্যে। তবু একই স্কুলে যেত। মা রান্না করতো। আরো কতো কাজ করতো। অথচ সর্বদাই হাসি খুশী থাকতো মা। বিকেলে স্কুল থেকে দিব্যরা যখন বাড়ি ফিরতো মায়ের মুখে যেন আলো ফুটে উঠতো।

আর দিব্যর মনের মধ্যেও আলো জ্বলে উঠতো বৈ কি। ঢুকেই সে পরোটা ভাজার গন্ধ পেতো। কাটুম-কাটাম সেই গন্ধ আর স্বাদের স্বাদ পায়নি কখনো।

ওরা অবশ্য জানে না এটা ওদের জীবনের একটা লোকসান। বরং বললে হেসে উঠবে, হয়তো বলে উঠবে, এ মা! বাবাই! কী হ্যাংলা ছিলে গো তুমি? পরোটা আবার একটা ভাল জিনিস নাকি?

দিব্যও কি এর আগে ভেবেছে কাটুমদের জীবনে কোথাও একটা লোকসান আছে? কোনো দিনই নয়। আজই হঠাৎ মনে হলো ওদের জীবনে মস্ত একটা লোকসানের ঘটনা আছে।

কিন্তু মা সর্বদা এত হাসি খুশী থাকতো কী সুখে? মা কি বোকা ছিল? চৈতালীর মুখে মাঝে মাঝে শুনতে পায় বুদ্ধিমানেরা কখনো আহ্লাদের সাগরে ভাসে না। ভাসতে পারে বোকারা।

তাহলে বলতে হবে একালে সবাই বুদ্ধিমান হয়ে গেছে। কই কাউকে তো তেমন আহ্লাদে ভাসতে দেখা যায় না। যেমন দেখেছে ছেলেবেলায়।

* * * *

লাবু অবশ্য চিরবোকা।

তাই লাবু সব অবস্থাতেই সুখে থাকতে পারে।

এখন লাবুর নিজেকে বেশ সুখী সুখী মনে হয়। বৈধব্য জিনিসটা লাবুর জীবনে এমন একটা অতীত অধ্যায় যে তার জন্যে লাবুর জীবনে ভয়ানক এক শূন্যতার তীব্রতা নেই।

এমন কি বোকা লাবুর বরটি যখন অকালে মারা গিয়েছিল, লাবুর নিজের বৈধব্যের হাহাকারে থেকেও তার শ্বশুর শাশুড়ীর পুত্রশোকের হাহাকারটা বেশী করে অনুভব করেছিল।

তাই নিজের দুঃখকে তুচ্ছ করে ওই একমাত্র সন্তানহারা দুটি মানুষকে সেবা দিয়ে যত্ন দিয়ে সান্নিধ্য দিয়ে আর নিজের শিশুপুত্রটিকে তাঁদের কাছে ঠেলে দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছে সেই পরম দুঃখ।

স্বামী চলে যাওয়ার থেকেও বেশী অসহায় বোধ করেছিল লাবু ওই মানুষ দুটি চলে যাওয়ায়। তবু আবার ছেলেটাকে ঘিরে আবার জীবনটাকে গড়ে নিয়েছিল লাবু। এবং এখন লাবু নিজেকে একটি সুখী মানুষ মনে করতে পারছে।

ছেলের চাকরী হয়ে লাবু অনেক দিনের অনেক সব ইচ্ছে বাসনা মিটিয়ে নিতে পেরেছে, এতে লাবুর সুখ। এখন যে লাবু একটু গুছিয়ে নিয়ে বসতে পেরেছে, এতে সুখ।

হলেও সামান্য চাকরী সামান্য আয়।

কিন্তু লাবুর ইচ্ছে বাসনাগুলোও তো কিছু একটা অসামান্য নয়।

লাবুর সাধ ছিল, রান্নাঘরের মাথার করোগেটের চালটা তুলে ফেলে একটু পাকা ছাদ করে নিতে। লাবুর সাধ ছিল, টিউবওয়েলের চারপাশটা একটু উঁচু করে সিমেন্টের পাড় গেঁথে নিতে, যাতে জল

নিতে যেতেই পায়ে কাদা না লাগে। লাবুর সাধ ছিল, ভাঁড়ার ঘরের তস্য পুরনো জালের আলমারিটার মরচে ধরা জালটা বাদ দিয়ে একটা নতুন জাল বসানো আর আলমারিটায় রং করিয়ে নেবার। লাবুর বাসনা ছিল, সাবেক কালের রাজ্যির পুরনো বিছানাগুলোকে ভাঙিয়ে চুরিয়ে ছেলের জন্যে ভাল এক সেট লেপ বিছানা বালিশ বানিয়ে নিতে। আর লাবুর বাসনা ছিল, ছেলের খাবার ভারী কাঁসার থালা গেলাশ বাটি পালটে নতুন ঝকঝকে স্টেনলেশ ষ্টীলের বাসন করাতে।

তা এসব আস্তে আস্তে হয়ে গেছে।

কিছুটা তো মাছের তেলেই মাছ ভাজা হয়েছে। একখানা ভারী কাঁসার থালা বদল দিয়েই তো এক সেট ষ্টীলের বাসন হয়ে গেছে।

হয়েছে আরো এমন সব কিছু কিছু সুবিধে।

-এতেই লাবুর সুখ

আর লাবুর সুখের পাত্রটি কানায় কানায় উপচে আছে, ভাগ্যিস ছেলেটা তার মার বোকামির বশে কলকাতায় মামার বাড়িতে বাস করার সিদ্ধান্ত ছেড়ে মায়ের কাছেই রয়ে গেছে।

অরুণ বাড়িতে না থাকলে কী এসব হয়ে উঠত লাবুর? টাকা হাতে পেলেও।

দুটি লোকের সংসার।

গোছানো আর পরিশ্রমী লাবুর হাতে সে সংসারের ব্যয়-বাহুল্য নেই বললেই চলে।

লাবু তার উঠোনের বাগানেই এত তরি-তরকারি ফলায় যে কিনতে হয় না সেসব। বরং হাত তুলে বিলোনোর সুখ পায়।

এত সুখে সুখী লাবুর মনের মধ্যে আর একটি সুখের ছবি উঁকি মারবে না এখন? বোকা মেয়েদের যা হয়।

তবে লাবু এখনো সেই ছবিটিকে মনের মধ্যে রেখে দিয়ে নিভৃতে লালন করছে। বোকারা যা করে।

ছুটির দিনগুলো লাবুর কাছে এক পরম সুখবাহী দিন। লাবু সকাল থেকে পাঁচরকম রান্না করে।

লাবু ছুটে ছুটে ছেলের কাছে এসে পড়ে গল্প করে।

আজও লাবু ছেলেকে চা জলখাবার ধরে দিয়ে সুখী সুখী মুখে বলে উঠল, কাল তোর ফিরতে যা দেরি হলো বলা হয়নি। বেশ ভাল একটা সুখবর আছে।

অরুণ হেসে বলল, কী সুখবর? তোমার লাউ গাছে একটা লাউ ধরেছে?

আহা সেটা ভারী একটা সুখবর বুঝি?

তোমার কাছে অন্ততঃ?

মোটেই না। সুখবর হচ্ছে মিণ্টুর খুব ভাল একটা 'সম্বন্ধ' জুটে গেছে। কাল পাত্র পক্ষ দেখতে এসেছিল। পছন্দ করে গেছে। বর না কি ম্যাড্রাসে কাজ করে। বড় চাকরী। ছুটি কম। বলেছে তার নিজের কনে দেখার দরকার নেই। বাড়ির লোক দেখলেই হবে। আজকালকার দিনে এমন কথা কে বলে বল? কী রে চা-টা খেলিনা?

এক চুমুক দেওয়া চা-টা নামিয়ে রেখে অরুণ বলল, কি জানি কেমন কড়া লাগল।

ওমা। তা আর একটু করে দিই?

না না থাক।

বাঃ। একটুও তো খেলি না।

ভাল লাগছে না। পরে খাবো। একটু ঘুরে আসি।

এখন আবার কোথায় ঘুরতে যাবি?

এখনই তো ভাল। পরে রোদ বেশী হয়ে যাবে।

লাবু হঠাৎ কেমন থতমত খেল।

ছেলের একটা ভাবান্তর তার চোখ এড়াল না। এটা কেন হলো!

বোকা লাবু একটু দিশেহারা হলো।

তবু সামলে নিয়ে বলল, জ্যেঠুর বাড়িই যাচ্ছিস বুঝি?

জ্যেঠুর বাড়ি? কেন?

ওই আর কী বিয়ের ব্যাপারে। পাত্তর ঠিক কী কাজ করে আমি তো অত বুঝিনি।

এত বুঝেই বা কী হবে ?

বলে চটিটা পায়ে গলিয়ে বেরিয়ে গেল অরুণ।

লাবু তাকিয়ে দেখল তার বিশেষ প্রিয় আলুর চপ এর দুখানা পড়ে রয়েছে।

বোকা লাবুর মাথার মধ্যে যেন একটা উড়ো চিল চক্কর খেতে লাগল।

একটু আগেই লাবু বড় সুখী সুখী ছিল।

লাবু ভাবছিল ছেলে আলুর চপের প্রশংসায় মুখর হবে (যেমন হয়)। আরো দু'খানা চেয়ে খাবে। যেমন দুষ্টুমি করে বলে, বাড়তি আর দু একটা আছে না কী ? তোমার কম পড়বে না তো ?

লাবু রেগে বলল, হ্যাঁ সেই ভয়েই তো মরছি ?

তারপর আরো দেবে জোর করে।

এবং তারপর লাবু সুখী সুখী মুখে উৎসাহের গলায় ও বাড়ির ভাসুরের মেয়ে দেখতে আসার গল্প করবে।

ভাসুর 'মেয়ে দেখানোতেই' পাকা দেখার মতো খরচা করে তাদের ভোজ খাইয়েছেন দেখে তো লাবু তাজ্জব। অবিশ্যি করবেন নাই বা কেন ? অভাবের সংসার তো নয় ? তাছাড়া অমন বড়লোকের ঘরে সম্বন্ধ। পাত্তর তো হীরের টুকরো। এ বিয়ে হলে সপরিবারে বর্তে যাবে।

তবে মিণ্টুটা চিরকেলে একবগগা তো। কিছুতেই সাজগোজ করে 'মেয়ে দেখানো' মতো দেখাতে দেবে না। রেগে ঝেঁজে একাকার। তো বাপ অনেক বোঝাতে রাজী হলো। কত গল্প ছিল।

লাবুর ভাগ্যে পরিস্থিতিটা কেমন বদলে গেল। লাবু যে ভাবতো ছেলের নাড়ি নক্ষত্র সব কিছু সে চেনে জানে বোঝে, সেটা কী তাহলে লাবুর ভুল অঙ্ক ? মিথ্যে অহঙ্কার ? কিন্তু এখন লাবু কী করবে ? লাবুর করবার কী ছিল ?

মানুষ সব সময় কি নিজের আয়ত্তে থাকে ?

মায়ের কাছে জোর গলায় বলে এল 'জ্যাঠার বাড়ি' যাবার কোনো

প্রশ্নই নেই। অথচ প্রায় নিজের অজ্ঞাতসারেই সেই বাড়িটাতেই এসে পৌঁছে গেল।

কিন্তু এটা কী আশা করেছিল এসে প্রথম মিণ্টুকে দেখতে পাবে? উঠোনের আধখানায় রোদ এসে পড়েছে। মিণ্টু উঠোনে টাঙানো দড়িতে ভিজে কাপড় মেলে দিচ্ছে।

রান্নাঘরের দিক থেকে বাসনপত্রের শব্দ জানান দিচ্ছে ওখানে কাজ চলছে। অর্থাৎ মিণ্টুর মা ওর মধ্যে।

মিণ্টু উর্ধ্বমুখী হয়ে উঁচু তারে বাবার একটা জামা ছুঁড়ে দিয়ে টানাটানি করে তাকে ধাতে আনছিল।

অরুণ পিছন থেকে হাত বাড়িয়ে সেটা ঠিক করে দিল।

মিণ্টু চমকে মুখ ফেরাল। বলে উঠল, এ মা। এ কী। তুমি কখন এলে?

এখনই। জ্যাঠা কোথায়?

মিণ্টু আজ একটু গম্ভীর। অরুণকে দেখলেই মুখে চোখে যে একটা আলো ঝলসে ওঠে আজ সেই ঝলসানিটা অনুপস্থিত।

বালতির মধ্যে বাকি ভিজে কাপড়গুলোর দিকে আর তাকালোও না মিণ্টু। শান্ত গলায় বলল, বাবার সঙ্গে দরকার থাকলে একটু অপেক্ষা করতে হবে। বাজারে গেছে বাবা।

অরুণ কপাল কুঁচকে বলল, জ্যাঠার সঙ্গে আমার কী দরকার?

তা কী জানি। এসেই বাবার খোঁজ করলে। ভাবলাম কোনো জরুরি দরকার আছে। হয়তো তোমার কোনো তালুক মুলুক বিকিয়ে যাচ্ছে। তাই—

অরুণ হঠাৎ তিক্ত ব্যঙ্গের গলায় বলে উঠল, খুব যে চালিয়াতের মতো কথা বলছিস। বড়লোকের গিন্নী হবার নামেই এত অহঙ্কার?

মিণ্টু জ্বলন্ত চোখে তাকাল।

কড়া গলায় বলল, অভদ্রের মতো কথা বলো না বলছি।

বাঃ। চমৎকার। শুধু অহঙ্কারই নয়। আরো কিছু।

মিণ্টু একটু সরে এলো।

বলল, তুমি কি এই কটূ কথাগুলো শোনাবার জন্যেই সকালবেলা এসে হাজির হয়েছো ?

ওঃ। কটূ কথা ? কথাগুলো খুব কটূ লাগছে তাই না। 'সত্য' বেশীর ভাগ সময়ই কটূ।

মিণ্টু হঠাৎ উঠোনের ধারে দাওয়ায় বসে পড়ে হতাশ গলায় বলে, বাজে ঝগড়া করে সময় নষ্ট করো না অরুণদা। ভেবে চিন্তে তাড়াতাড়ি একটা কিছু করো।

অরুণ তবুও অনমনীয়।

হয়তো নিজের অক্ষমতা অসহায়তা, তাকে এমন উল্টোপাল্টা কথা বলিয়ে নিচ্ছে। অরুণ কি ভাবতে পারছে ও মিণ্টুর বাবার অথবা মার কাছেই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলতে পারবে, 'আপনারা এখনই মিণ্টুর বিয়ের জন্য চেষ্টা করবেন না। আমায় একটু সময় দিন।'

তাই কী সম্ভব ?

মিণ্টুর মা বাবা যদি মুখের ওপর হেসে উঠে বলেন, আরে অরুণ! তোমার মাথা ফাতা খারাপ হয়ে গেল নাকি? মিণ্টুর ব্যাপারে তোমায় সময় দিতে বসব ? হা হা হা!

অরুণ অতএব অক্ষম পুরুষেরা যা করে থাকে তাই করলো। মিণ্টু নামের মেয়েটার ওপরই আপন অসহায়, অক্ষমতার ঝালটা ঝাড়ল। বলল, আমি? আমি ভেবে চিন্তে কি করতে পারব? আমার কি এক্তিয়ার আছে? সেই যে চিরকেলে কথা আছে বামন হয়ে চাঁদে হাত না কি। সেটা তাই হবে।

কথাটা অরুণ খুব বেশী ভুল বলেছে এমন বলা চলে না। মিণ্টুর বাবা শরৎ রায় পাড়ার মধ্যে একজন বর্ধিষ্ণু অবস্থার লোক। পর পর দু তিনটি শিশুর অকাল বিয়োগের পর ঠাকুর দেবতার দোর ধরা মেয়ে মিণ্টু। তার জন্যে শরৎ অন্ততঃ সহজে অরুণের মতো পাত্র নির্বাচন করবেন না।

অরুণের দিকের পাল্লায় কোনো ভারী বাটখারা নেই। তাই অরুণ হালকামিই করে বসে।

বলে, আমি? আমি কিছু একটা করবার কে?

মিণ্টুর চোখটা আবার জ্বলে ওঠে।

বলে, তাহলে কে করবে?

করাকরি আর কি আছে? বড়লোকের গিন্নী হবি সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করবি।

এর আগে মিণ্টু কোনোদিন নিজেকে এভাবে উদ্‌ঘাটিত করেনি। কিন্তু আজ বেচারী বড়ই উদ্বেলিত। গতকাল থেকে তার মনের মধ্যে বয়ে চলেছে একটা ব্যাকুলতার ঝড়। সারারাত ভেবেছে কিভাবে কখন অরুণের সঙ্গে দেখা হবে। কিভাবে তার শরণ নিয়ে বলবে, 'এ হতে দেওয়া যায় না'।

এতদিন স্পষ্ট ভাষায় তো জানাতে যায়নি কিছু। দু'জনের কেউই না। শুধু চোখের ভাষা কাজ করে চলেছে। অথবা যখন 'চোখের ভাষা'য় কথা বলতে শেখেওনি তখন থেকেই, কোন কাল থেকেই একটা অলিখিত দলিলে লেখা হয়ে আছে ওদের পরস্পরের ওপর একটা আধিপত্য আছে। একে অপরের নিজস্ব সম্পত্তি।

কিন্তু এখন মিণ্টু নামের মেয়েটা দেখছে উদ্‌ঘাটিত হয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

মিণ্টু রেগে উঠে বলল, দ্যাখো অরুণদা বাজে কথা বলে দায়িত্ব এড়াবার চেষ্টা করো না। বাবাকে বলতে না পারো মাকেই বলো।

কি বলব?

ওঃ। অসহ্য। কি বলবে তাও বলে দিতে হবে? কেন তোমার দিকে কী কিছুই বলবার নেই?

অরুণ উদাস গলায় বলল, থাকলেও বলবার মুখ কোথায়?

অরুণদা! মুখটা কি শুধুই বড় চাকরির ওপর নির্ভর করে?

তাছাড়া আর কি? রাজকন্যে আর রাখাল ছেলের গল্প রূপকথাতেই মানায়।

থামো। ফালতু কথা ছাড়ো। মাকে গিয়ে বলগে জ্যাঠাইমা মিণ্টুর অন্যত্র বিয়ে হতে পারে না।

অরুণ একবার নির্নিমেষে ওর দিকে তাকালো।

তারপর বললো, এ কথাটা আমার বলা মানায় না মিণ্টু। বলতে হলে তোমায় বলতে হয়।

আমায় বলতে হয়!

তাই তো। তাছাড়া আর কার একথা বলবার অধিকার আছে?

তার মানে তুমি একটা কাপুরুষ।

অধম পুরুষরা কাপুরুষই হয় মিণ্টু। কোন শক্তির জোরে বীরপুরুষ সাজাবার ধৃষ্টতা করতে যাবে তারা?

মিণ্টুর হঠাৎ চোখ ফেটে জল আসে।

মিণ্টু কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, ঠিক আছে। বুঝলাম! বুঝলাম আমার জন্যে তোমার কোনো মাথা ব্যথা নেই।

আবার পিছন ফিরে বালতি থেকে ভিজে জামা কাপড়গুলো তুলে নিয়ে ঝেড়ে ঝেড়ে তারে মেলে দিতে লাগল মিণ্টু।

অরুণ বলল, যাচ্ছি।

মিণ্টু কথা বলল না।

মিণ্টু নিজের ঘরের মধ্যে চলে গিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল।

মিণ্টুর বাবা বাজার থেকে ফিরে ডাক দিলেন মিণ্টু, মিণ্টু।

মিণ্টু উঠল না।

কি করে উঠবে? ওর দারুণ পেটব্যথা করছে না?

* * * *

ভবেশের ডেরা থেকে বেরিয়ে পড়ে সৌম্য আর ব্রততী পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে একটু থামল।

সৌম্য বলল, তোমার কি ফেরার জন্যে বেশী তাড়া আছে?

ব্রততী একটু তাকিয়ে বলল, আমার কথা তো জানোই। বাড়িতে আমার দেরি হলে কেউ বকে না। শুধু নীরব ভৎ´সনার চোখে তাকায়।

সৌম্য একটু হাসল।

তার মানে যেটা বকুনির থেকে বেশী মারাত্মক। তাই না?

বোধহয়। কিন্তু কী ব্যাপার?

ব্যাপার কিছু না। ভাবছিলাম কোথাও একটু বসে এককাপ সত্যি চা খেতে পারলে মন্দ হতো না।

এখানে কোথায়?

না এখানে নয়। হাঁটা যাক খানিকটা।

ব্রততী বলল চল।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে সৌম্য হঠাৎ বলে উঠল, ভবেশদার কেসটা তুমি জানো ব্রততী?

বিষণ্ণ লাগল সৌম্যর গলার স্বর।

ব্রততীর মুখে চোখেও সেই বিষণ্ণতার ছোঁয়া লাগল।

বলল, অনুমানে বুঝি।

অথচ উনি রোগটাকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে চান।

ব্রততী বলল, আমার মনে হয় ভবেশদা ঠিক বুঝতে পারেন নি। তাই তেমন গুরুত্ব দিতে চাইছেন না।

সৌম্য একটু হাসল।

বলল, হাণ্ড্রেড পার্সেণ্ট বুঝেছেন। এবং বুঝেছেন ক্যানসারকে দাবাতে গেলে আরো বেড়ে ওঠে। তাই ওকে না ঘাটিয়ে নিজের কাজ করে যেতে চান যতটা পারেন।

কিন্তু সৌম্য, ফার্স্ট স্টেজে ধরা পড়লে তো—

ওটা একটা ছেলে ভুলানো কথা ব্রততী। ফার্স্ট স্টেজে ধরা পড়ে না। কোনো লক্ষণেই নয়। আর যখন ধরা পড়ে তখন আর করার কিছু থাকে না।

ভবেশদার হঠাৎ এরকম হবে কখনো ভাবা যায়নি।

যা ভাবা যায় না সেই। এরপর কি আর এভাবে কাজ এগোনো যাবে?

বিষণ্ণ একটু নিশ্বাস ফেলল।

সৌম্য বলল, চালাতে তো হবেই। আমাদের দেশের বেশির

ভাগ কাজই ব্যক্তি মানুষের প্রতি নির্ভরশীল। তাই মানুষটার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠানেরও মৃত্যু ঘটে।

ব্রততী আস্তে বলল, সকলের মধ্যে তো আগুন থাকে না। তারা অপরের আগুনে আলোকিত হয়। সেইটুকুতেই তাদের কর্মশক্তি।

সৌম্য বলল, হয়তো !

তারপর বলল, আর চা খেতে ইচ্ছে করছে না কিন্তু তুমি কিছু মনে করবে ?

ব্রততী হেসে ফেলল।

আমি নিশ্চয় চা খাবার বায়না করিনি।

তবে থাক। একটু হাঁটাই যাক।

না, বসা চলে না।

কোনোখানে কোথাও দুটো ছেলেমেয়ে কাছাকাছি বসলেই লোকের একজোড়া চোখ একশো জোড়া হয়ে উঠবে। বরং অনেকের ভিড়ে পাশাপাশি হাঁটা কিছুটা নিশ্চিন্ততার।

কী আশ্চর্য।

এ তো সমান অধিকারের ঢেউ। এ তো নারী মুক্তির উচ্চরব। মেয়ে আর পুরুষ একই জায়গায় কাজ করে চলেছে। তবু দুটি নরনারী একত্র হলেই অপরেরই শুধু নয়, নিজেদের মধ্যেই অস্বস্তি এসে হাজির হয়।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা বাসের রাস্তাতেই চলে এলো।

ব্রততী বলল, কি করবে ? আরো হাঁটবে ?

না, থাক। উঠেই পড়া যাক।

এই বাসটা ব্রততীর গন্তব্যস্থলে পৌঁছয়, সৌম্যর খানিকটা।

উঠে পড়ল।

দুজনকেই দাঁড়াতে হলো। তবে পাশাপাশি নয়।

সৌম্য একবার শুধু বলল, কি করলাম বল তো বোকার মতো ? তোমায় চা খাওয়াবো বলে খাওয়ালাম না। অকারণ হাঁটলাম।

আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে।

ব্রততী কখন নেমে গেল মানুষের দেয়াল ভেদ করে দেখতে পেল না সৌম্য।

*　　　*　　　*　　　*

এইভাবেই চলতে থাকবে তাহলে?

পূর্ণেন্দুর বৌ অলকা একবার তাকিয়ে দেখে নীরবে চলে গেল।

ব্রততী বলল, বোধহয় বেশীদিন চলবে না।

তার মানে?

মানে কিছু না। মা কোথায়?

মা আর কোথায় যাবেন? তাঁর তো আর পতিতোদ্ধারের কাজ নেই।

ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল অলকা। ব্রততী মায়ের ঘরে অর্থাৎ মা আর তার যুগল ঘরে চলে এলো। দেখল মা গুম হয়ে বসে আছে। মেয়েকে দেখেও কিছু বলল না। ব্রততী কিছু না বলে স্নানের ঘরে চলে গেল। অনেকক্ষণ ধরে গায়ে জল ঢেলে যখন ফিরে এলো তখন শরীরটার সঙ্গে মনটাও বেশ স্নিগ্ধ হয়ে এসেছে। দেখল মা সেই ভাবেই বসে আছে।

বলল, মা খুব খেপচুরিয়াস?

দরজা খুলে একবার দেখল ব্রততীর কাকা পূর্ণেন্দু। কোনো কথা বলল না। দরজাটা খুলে যাকে বলে 'অবলোকন করা' সেই দৃষ্টিতে একবার ভাইঝির আপাদমস্তক দেখে নিয়ে 'অ্যাবাউট টার্ণ' করে ঘরে ঢুকে গেল।

ব্রততী নিজের ঘরে আসতে আসতে কাকার ঘরের মধ্যে থেকে কাকীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, আজ তো তবু সকাল সকাল গো।

হাড় জ্বলে যাবার পক্ষে এটাই যথেষ্ট। কিন্তু এতে হাড়কে জ্বলতে দিলে এতদিনে তো ব্রততীর হাড় কাঠকয়লা হয়ে যেত।

নিজের ঘর মানে মায়ের ঘর। যার বর জোটেনি তার আবার নিজের ঘর কী! বর নেই, ঘরও নেই। পাঠ্যাবস্থায় 'নিজের ঘর' বলে একটা ছোট্ট 'পড়ার ঘর' ছিল। কিন্তু সেটা এখন কাকার ছেলে মেয়ের দখলে। ওরা ওই ঘরটাতেই পড়ে। সন্ধ্যেবেলা মাস্টারমশাই আসেন। কাকী অবশ্য দেয়ালকে শুনিয়ে আক্ষেপ করেছে তখন, যখন মাস্টার রেখেছে।

বাড়িতে একখানা জলজ্যান্ত ইস্কুলের দিদিমণি, অথচ মাইনে দিয়ে মাস্টার রাখতে হচ্ছে। একেই বলে কপাল।

কথায় কথায় কপাল তোলা কাকীর এক মুদ্রাদোষ। হ্যাঁ ব্রততী একটা স্কুলে পড়ায়। কিন্তু তার বাইরের সময়টুকু তো ব্রততী ভবেশদার সমিতিতে উৎসর্গ করেছে। তাছাড়া পড়িয়ে সুখ আছে না কী? ওদের খুব ছোটবেলায় চেষ্টা করেছিল তো। কিন্তু কাকার মেয়েটার এত দুর্বুদ্ধি পড়া না পারলেই ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদতে কাঁদতে মায়ের কাছে গিয়ে বলতো—দিদি বকেছে।

অতএব স্নেহময়ী মা ষাট ষাট বাছারে বলবে না? বলবেই তো, থাক আর পড়তে হবেনা।

তা সে পর্ব চুকে গেছে।

বাড়িটা ঠাকুর্দার আমলের তাই ব্রততীর বাবা কাকা দুজনার সংসারই এখানে আশ্রয় পাবে এটাই স্বাভাবিক। ব্রততীর বছর বারো বয়েস পর্যন্ত ঠাকুমাও ছিলেন, এবং একটাই রান্না ঘর ছিল। যে ঘরে একটা বড় হাঁড়িতে ভাত রান্না হতো।

তা সে তো তামাদি কথা। ব্রততীর তো এখন ছাব্বিশ বছর বয়েস। ঠাকুমার বিয়োগের পর বড় হাঁড়িটা মেজে ঘষে তাকে তোলা হয়ে গিয়েছিল। কারণ কাকা একদিন তার দাদার কাছে এসে বলেছিল, দাদা! আমার মনে হয় রান্নাটা সেপারেট ভাবে করলেই ভাল হয়।

দাদা হাঁ হয়ে গিয়েছিল।

রান্নাটা সেপারেট?

হ্যাঁ হ্যাঁ। অত অবাক হবার কী আছে? এমন দেখনি কখনো? বাড়িতে যা রান্নাবান্না হয়, তাতে প্রোটিনের ব্যবস্থা তো খুব বেশী থাকে না। গাছপালার সংখ্যাই বেশী। তাছাড়া তেল মশলা ঝাল এসবের তো বালাই দেখি না। কাঁহাতক আর রুগীর পথ্যি খেয়ে যাওয়া যায়?

দাদা তবু কাতর হয়ে বলেছিল, তো তোর বৌদিকে বললেই তো পারিস, রান্নাটা যাতে একটু জম্পেস হয়। আচ্ছা আমিই বলে দিচ্ছি।

কাকা বলেছিল, থাক ওতে কোনো ফল নেই। অলকা দেখছি জনতা স্টোভ-টোভ কী সব আনিয়েছে।

তদবধি ঠাকুমার দিকের নিরামিষ ঘরটাতেই ব্রততীদের রান্না চলতো। এবং অতঃপর বাবা অকালে সরে পড়ার পর মারও সেটাই কায়েমী হলো।

ব্রততী নিজের জন্যে মাছটাছ রাঁধতে দেয় না মাকে। গাছপালা খেয়েই চলে দুই মাতাকন্যার।

মা খুঁৎ খুঁৎ করলে ব্রততী বলে, আরে বাবা ইচ্ছে হলে বাইরে কিছু খেয়ে নিতে পারি। খাইও তো। টিফিনের সময় চা ডিম সেদ্ধ। তবে গাছপালাতে প্রোটিন নেই একথা তোমায় কে বলেছে? বুঝে খেলে প্রচুর আছে।

কিন্তু মেয়ে বরাবর বাড়িতেই থাকবে, মায়ের সঙ্গে গাছপালার সম্ভার খেয়ে কাটাবে, এমন ব্যবস্থা আর কোন মায়ের মনঃপূত হয়? কিন্তু ব্রততী বলে, সব মেয়ের জীবনই কি একই ছাঁচে ঢালাই হতে হবে মা? কেন, তুমি আমি এমন কী খারাপ আছি?

আমি চিরকাল থাকব?

ততদিনে আমি বুড়ি হয়ে যাব। একাই থাকতে পারব। বাড়িটা থেকে তো বিতাড়িত হবার ভয় নেই।

এখন ব্রততী ঘরে এসে দেখল মা জানলামুখো হয়ে একটা টুলে বসে আছে। গুম হয়ে।

ব্রততী ঢুকেই বলে উঠল, মা দারুণ খিদে পেয়েছে।

ব্রততী জানে মায়ের রাগ ভাঙাতে এটাই ব্রহ্মাস্ত্র। কিন্তু আজকে মা তাড়াতাড়ি উঠল না। কথাও বলল না। সরে এসে বলল, মা মনে হচ্ছে খুব খেপচুরিয়াস? ছোট তরফ বুঝি বেদম তুলো ধুনেছেন?

মা ফিরে বসে বলে উঠল, ধুনে থাকলে তোমার গুণেই ধুনেছে। তুমি একটা আইবুড়ো মেয়ে এত রাত পর্যন্ত বাইরে থাকবে—

মা!

ব্রততী শান্ত গলায় বলল, তুমি জানো না কেন থাকি?

আমি জানলে কী হবে।

মা হতাশ গলায় বলে, ওরা ওই নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করে। বলে মেয়ে পতিতোদ্ধার করছেন।

করুক না। বয়ে গেল। তুমি কেয়ার কর কেন?

এক বাড়িতে থাকতে হয়। কেয়ার না করলে চলে?

মনে করলেই পারো ওটা পাশের ফ্ল্যাট।

চমৎকার। মনে করলেই হলো? একসঙ্গে বসবাস—

একসঙ্গে? কোনখানটায় বলো তো মা? ওনাদের রান্নাঘর আলাদা, বাজার আলাদা, বাসন মাজুনি আলাদা, ধোবা আলাদা, রেশন কার্ড আলাদা, এমন কী খবরের কাগজওলা পর্যন্ত আলাদা। একসঙ্গেটা কোথায়?

ব্রততীর কথাটা সত্যি বৈকি।

পূর্ণেন্দু একে একে এসব আলাদা করে নিয়েছে। অবশ্য পূর্ণেন্দু আর কে? সে তো পুতুল নাচের পুতুল মাত্র।

ব্রততী জানে এসত্ত্বেও মার ওদের সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগাযোগ ছিন্ন করতে প্রাণ ফাটে। মার এখনো সেই একান্নবর্তী দিনগুলোর ছবি মনে ভাসে। মা কাকার ছেলেমেয়ে দুটোর সঙ্গে দুটো কথা না কয়ে থাকতে পারে না। ডেকে ডেকে কয়। উত্তর দিতে অনিচ্ছুক ভাব দেখেও।

আর কাকা যখন কোনো কারণে ডেকে কথা কয়, মা যেন কৃতার্থ হয়ে যায়। এই কথা কওয়াটা অবশ্য নিতান্তই বৈষয়িক। বাড়ির ট্যাক্স দেবার সময় অথবা ইলেকট্রিকের বিল মেটাবার সময় ভাগটা দেবার জন্যে কথা বলার দরকার।

আসলে মা এখনো ওদের ভালোবাসে। ওরা যত খারাপ ব্যবহারই করুক মা কিছুতেই কাট্ আপ করে থাকতে পারে না। এ এক আশ্চর্য হৃদয় রহস্য।

মা এখনো বার-ব্রতর দিন ছোটজাকে ডেকে বলে, অলকা, তুমি আর কষ্ট করে আলাদা শুদ্ধাচারের পাট করবে কেন? আমার এখানে তো সবই শুদ্ধাচারের। এখানেই না হয় তোমার দুখানা খাবার করি?

অলকা বলে, ও আমি করে নিয়েছি।

তবু মা বলে, অলকা মঙ্গলচণ্ডীর কথা শুনবে তো এসো।

অলকা বলে, সে আমি সকাল বেলাই ব্রতকথার বই থেকে পড়ে নিয়েছি।

মা বলে, অলকা! দেবু বলছিল তোমার না কি জ্বর হয়েছে? তাহলে রাতের রুটি কখানা আমি এখান থেকে করে দিচ্ছি ভাই।

এহেন কালে হয়তো জবাবটা কাকাই বেরিয়ে এসে বলে, ও বলছে কাজের মেয়েটাকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছে।

ওমা কখন করলো এর মধ্যে? তা যাক! সকালেই যেন আবার তোমার অফিসের জন্যে হাঁড়ি চড়াতে বসে না। আমাকে তো তুতুর জন্যে করতেই হবে।

সকালের ভাবনা সকালে ভাবলেই চলবে বৌদি। ও নিয়ে আর এখন তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই।

ব্রততী ঘরের মধ্যে কপালে দুহাত জোড় করে বলে, নমস্তে মা। শুধু 'মা' বলেই নয়, মহিয়সী মহিলা বলে ডবল প্রণতি।

মা অপ্রতিভ হয়।

বলে, থামতো। দিনে অদিনে পাড়া-পড়শীকেও দেখতে হয়।

দেখতে দিলে তো দেখবে মা। তোমার অফার ওনারা নেন্ন?

নেবে কী! তোর খুড়ির যা মদগর্ব।

ব্রততী মনে হাসে। আবার দুঃখও পায় মায়ের এই খেলোমি দেখে। তবু তো সুনীলা এসব 'অফার' যতটা সম্ভব ব্রততীর আড়ালেই করে। কিন্তু সবসময় তো তা হয় না।

ব্রততী বলল, খিদেটার মৃত্যু ঘটল।

মা এখন উঠে পড়ল।

ব্রততী মাঝে মাঝে ভাবে বাড়িটা যদি দাদুর বানানো না হতো যদি ভাড়াটে বাড়ি হতো যে করেই হোক মাকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে যেতুম। অনাত্মীয়ের মধ্যে থাকা যায় কিন্তু আত্মীয় হয়েও যারা অনাত্মীয়? তাদের সঙ্গে থাকা কী কষ্টকর!

ব্রততী ভেবে পায় না, কি করে আর কবে থেকে এমনটার শুরু? ছেলেবেলায় তো কাকার তুতু অন্ত প্রাণ ছিল। ব্রততীরও ছিল সব আবদার বায়না কাকার কাছে। বাবার থেকেও কাকাকেই বেশী আপন মতে হতো।

কী আশ্চর্য! কী করে এমন বদলে যায় মানুষ?

ভাবতে ভাবতে একটু হাসে। সব মানুষ অবশ্য বদলায় না যেমন মা।

আজ যদি হঠাৎ কাকা বলে, 'কাল থেকে আবার একসঙ্গে রান্না হোক।' মা বোধহয় হাতে স্বর্গ পাবে।

এইভাবেই চালিয়ে চলেছে সুশীলা আর ব্রততী নামের মেয়েটা।

রাত্রে শুয়ে সুনীলা হাত বাড়িয়ে পাশের খাটে শোওয়া মেয়ের গায়ে একটু হাত ঠেকিয়ে বলল, তুই তাহলে বিয়ে-টিয়ে করবি না?

কী মুস্কিল। ঘুমে মরে যাচ্ছি এখন তুমি-ঘুমোতে দাও বাবা।

যখনি বলি কেবল কথা এড়াস। স্পষ্ট কথাটা বল তো শুনি। বিয়ে না করে চলবে চিরকাল?

কী আশ্চর্য! কখনো করব না এমন ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা আবার কখন করলাম?

অ্যাঁ। ঠিক বলছিস?

মা ধড়মড়িয়ে উঠে বসে আর্তনাদের গলায় বলল, ঠিক বলছিস? আমার গা ছুঁয়ে বল।

আমি ওসব ছোঁয়াছুঁয়িতে বিশ্বাসী নই। তা বিয়েটা কী এখন এই রাত্তিরেই করতে হবে? পাত্র রেডি? লগ্ন আছে? নাপিত পুরুত বরণডালা?

মা একটু কৌতুকের গলায় বলল, এই রাত্তিরেই না হোক। আছে। বাবাঃ। এমনভাবে কথা বলিস। তবে বলি শোন—অলকার এক মামাতো দিদির ছেলে। বি-কম পাশ। চাকরী-ক্যাকরীর দিকে না গিয়ে বিজনেস করছে। আর এই তিরিশ একতিরিশ বছর বয়সের মধ্যেই তোর ভাষায় বলি 'দারুণ' উন্নতি করেছে। বাড়ির নাকি হাল ফিরিয়ে ফেলেছে। ফ্রীজ, রঙিন টি.ভি, টেলিফোন, আগে নাকি মোটর বাইক ছিল এখন সম্প্রতি গাড়ি কিনেছে। খুব মাতৃভক্তি। কিসে মায়ের কষ্ট না হয় তার চেষ্টা। আহা অলকার দিদি বেচারী সধবা থাকতে কখনো একখানা ভাল শাড়ি পরতে পায়নি। এখন ছেলে দামী দামী শাড়ি এনে মাকে পরাচ্ছে জোর করে। গাড়ি কিনে সব আগে মাকে চড়িয়ে কালীঘাটে নিয়ে গেছে।

ব্রততী বুঝল, আজ তাহলে ছোট তরফ বড় তরফের সঙ্গে বেশ খানিকক্ষণ আলাপ সালাপ চালিয়েছেন। তাই মায়ের মুখটা আজ ফর্সা ফর্সা লাগছিল তখন।

মনে মনে হেসে ব্রততী মুখে খুব নিরীহভাবে বলে, ওরে ব্বাস! তাহলে তো বলতেই হবে দারুণ পাত্র। তো এ ছেলের জন্যে তো অর্ধেক রাজত্ব আর একখানা রাজকন্যে জুটবে। বেচারী সুনীলা সেনের একটা লক্ষ্মীছাড়া মেয়েকে অফার কেন?

মা রাগের গলায় বলে, কথার ছিরি দ্যাখো। লক্ষ্মীছাড়া আবার আবার কী। তোরও দেখছি মন কুটিল হয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ। অলকার মামাতো দিদি তো তোকে দেখেছে কতসময়। ভাল লেগেছে। তাছাড়া বলেছে নাকি এমন একটি মাতৃভক্ত মেয়েকে ঘরে নিয়ে গেলে তার

ছেলেটার আর বিগড়ে যাবার ভয় থাকবে না। জানবে 'মা'কে দেখতে হয়, ভালবাসতে হয়।

অ্যাঁ। এই কথা বলেছেন তোমার অলকা।

আহা অলকা কেন, বলেছে ওর সেই দিদিই। তবে তোর দেমাকি খুড়ি বলেছে তো মান খুইয়ে।

ব্রততী বোঝে, 'দেমাকি খুড়ি' এই 'সম্বন্ধ' দিতে আসার ব্যাপারে নিজেকে নির্লিপ্ত রাখতে এতখানি যুক্তি খাড়া করেছে। দিদি যা বলেছে তাই বলবে তো।

মা মেয়েকে একটু চুপ করে থাকতে দেখে 'সম্মতি লক্ষণম' ভেবে উৎসাহের গলায় বলে, দেখিস এ বিয়েটা হলে তোর খুড়ো খুড়িরও মন গলবে। আবার মেলামেশা করতে আসবে। হুঁ বাবা। স্বার্থ এমন জিনিস। এই বিয়ের কথাতেই তো লাখ কথা কইতে হবে! কী বলিস? অ্যাঁ?

ব্রততী আলো নিভোনো ঘরেও মায়ের মুখের আলোটি অনুভব করে। একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, তোমার জন্যে বড় দুঃখ হয় মা। আর নিজের জন্যেও।

ও মা! এ আবার কী কথা?

সুনীলা থতমত খেয়ে বলে, এর মধ্যে আবার দুঃখের কী এলো?

বুঝবে না মা। তবে আমি বুঝতে পারি, শুধু আমায় নিয়ে তোমার মন ভরে না।

সুনীলা বোকা। তবু—

সুনীলা একটু থমকায়। মনে মনে বলে, আমি কি তোমার মনের নাগাল পাই মা। তাই ভরবে? ওদের তো তবু বুঝতে পারি। তোমায় তো বুঝতে পারি না। তুমি আমার সঙ্গে কথা বল যেন ছেলে ভোলাচ্ছ। ওরা টক্কর দিয়ে কথা কয়। তা জানি। তা হোক তার মানে আস্ত একটা মানুষই ভাবে আমায়।

তবে নিজেকে সামলে নেয় সুনীলা।

হতাশ গলায় বলে, মেয়ে বড় হলে বিয়ের কথা তো তোলেই মা

লোকে। কেউ যদি যেচে সম্বন্ধ দিতে আসে কেন নেবো না? ঠিক আছে! বলে দেব মেয়ে বিয়েতে রাজী নয়।

মা দেয়াল মুখো হয়ে শোয়।

ব্রততী হাত বাড়িয়ে মায়ের পিঠের কাপড়টা একটু টেনে হেসে বলে, এই তো পর্শু না কাল তুলো ধুনলেন। কখন আবার এসব প্রেমের কথা হলো?

তার মানে সুনীলা যাকে ছেলে-ভুলোনো কথা বলে।

সুনীলা কথা বলল না।

বলবে কি, বলতে গেলেই কান্না এসে যাবে।

অলকার ওই যেচে এসে পাত্রের খবরের কথা বলার পর থেকে কত রঙিন ছবিই আঁকছিল বেচারী!

* * * *

বরকে ঠেলে নিয়ে কঙ্কণার অ্যাডভোকেট বান্ধবীর বাড়িতে বেড়াতে এলো চৈতালী।

নিজেকে যতই স্মার্ট ভাবতে চেষ্টা করুক চৈতালী মার্কেটিং ব্যতীত অন্য যে কোনো জায়গায় বর সঙ্গে থাকলেই যেন বেশ নিশ্চিন্ততা বোধ করে। এবং যখনি বরকে সঙ্গে যেতে বলে তখনি এক পালা গেয়ে নেয়, একখানা গাড়ি থাকলে চৈতালী বিশ্ব সংসারে কারুর ধার ধারত না।

যেখানে রাস্তাটাস্তা চেনে না, সেখানে ট্যাক্সী নিয়ে একা যাওয়া যায়? দিনকাল কেমন?

কঙ্কণার বান্ধবীটি বাড়ি নেই দেখে হাড়ে বাতাস লাগল দিব্যর। বাঁচা গেছে বাবা!

চৈতালী অবশ্য একটু ক্ষুণ্ণ হলো। একটা দ্রষ্টব্য বস্তু দেখা হলো না।

কিন্তু কঙ্কণাই কি কম দ্রষ্টব্য?

কঙ্কণার পরনে শালোয়ার কামিজ। আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট।

চৈতালী একটু মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায়। দিব্য দেখুক মেয়েরাও কত

ফ্র্যাঙ্ক আর ফ্রী হ'তে পারে। খাবেই যখন তখন পুরুষের মুখের সামনে ধোঁয়া ছেড়েই খাবে।

তা তাই খেল করুণা।

মুখের মধ্যে ভরে রাখা ধোঁয়াটা বার করে উড়িয়ে দিয়ে বলল, আয়। জানি, তুই না এসে পারবি না। এই যে মিস্টার। বলুন কী খবর ?

দিব্য একটু হাসে।

খবর তো আপনার কাছেই।

হি হি, তা বটে। কবর থেকে বেরিয়ে এসে পরে একখানা 'খবর' হয়ে গেছি বটে। বসুন। তবে আগেই বলে রাখি এখানে গেস্টকে আপ্যায়ন করা যাবে না। বাড়িটা আমার নয়।

চৈতালী তাড়াতাড়ি বলল, আচ্ছা ঠিক আছে। কে চায়ের জন্যে মরছে ?

কঙ্কণা মনে মনে বলল, মরলেও পেতে না। বাড়ির মালিকানি সে বিষয়ে খুব হুঁশিয়ার। ভাঁড়ারের চাবি হাত ব্যাগে ভরে নিয়ে বেরিয়ে যান।

চৈতালী বলল, কঙ্কণাদি আমাদের তিনকূলে তুমিই বোধ হয় প্রথম এরকম একটা সাহসের দৃষ্টান্ত রাখলে।

'বোধ হয়' আবার কী। নিশ্চিত। আমাদের তিনকুলের কারো মধ্যে প্রগতির কোনো ছাপ আছে ? এই অপরাধে মা তো আমার মুখ দেখে না। মাসি মানে তোর মাও নাকি তোর ছোট বোন বৈশালীটাকে কড়কে রেখেছে আমার সঙ্গে দেখা না করতে। এই সামনে দিয়েই তো কলেজ যায়। আশ্চর্য! মেয়েকে লেখাপড়া শেখাব, বাইরে ছেড়েও দেব, মানে দিতে বাধ্য হবো, অথচ আশা করব মেয়ে সেই আদ্যিকালের মনোভাব নিয়ে বেড়ে উঠবে।

কঙ্কণা ঝিমিয়ে আসা সিগারেটটায় হুশ হুশ করে আর দুটো টান দিল।

দিব্য বলে, চৈতালি, একা ফিরতে পার তো বসো আরও যতক্ষণ

ইচ্ছে, আমার একটু কাজ ছিল।

বাজে কথা বোলো না। এখন আবার তোমার কী কাজ?

বাঃ, কাজ থাকতে পারে না?

না। পারে না। আমার অজ্ঞাত কোনো কাজ তোমার থাকতেই পারে না।

আরে বাবা, আমি বসে থেকে ছন্দভঙ্গই বা করি কেন? তোমরা দুজনে প্রাণ খুলে গল্প কর। এই পার্ক সার্কাসে নীরুর বাড়ি না? এখুটা এসেছি একটু ঘুরে যেতাম।

একা ফেরার নামে খারাপ লাগে চৈতালীর। তাছাড়া মনে হয় কঙ্কণাদির সামনে এতে তার পোজিশান নষ্ট হয়ে যাবে। চৈতালীর জন্যে এটুকু সময় দিতে পারে না তার বর?

বলল, রাখো তোমার নীরুটিরু। আমি যতক্ষণ বসে থাকব, তুমিও ততক্ষণ থাকবে?

কঙ্কণা আর একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলে, গুড্ বয়-এর তো এসব চলে না। কী আর করা। চৈতালীটার কোনো ক্যাপাসিটি নেই। এতদিনেও মানুষ করে তুলতে পারল না। ঠিক আছে। ভ্যাবলা হয়ে বসে থাকুন। এমন কোনো সিক্রেট টক্ হবে না আমাদের যা আপনার সামনে চলতে পারে না। চৈতালীকে আমি আমার বান্ধবী বহ্নিশিখার কাছ থেকে শোনা কেস-এর হিস্ট্রী শোনাবো। ভেরি ইন্টারেস্টিং। কীভাবে আস্তে আস্তে মন বদলাতে থাকে, আর তারপর কীভাবে—

অর্থাৎ কঙ্কণা এখন বসে বসে কিছু 'বিয়ে ভাঙার' ইতিহাস শোনাবে বোনকে।

দিব্য মনে মনে বলল, অবশ্যই এইসব কাহিনীর নায়ক এক একটি ভিলেন হবে। তার মানে চৈতালীকে বেশ খানিকটা বিষাক্ত করে তোলা হবে।

কিন্তু নিরুপায়।

দিব্যর পক্ষে তো আর সম্ভব নয়, তাড়া দেওয়া। বলে ওঠা, চলো

চলো। অনেক দেরি হয়ে গেছে।

কেন কোনো কিছুতেই চৈতালীর কাজে প্রতিবাদ সম্ভব হয় না দিব্যর। কেন দিব্যর সব ব্যাপারেই চৈতালী প্রতিবাদ তুলতে পারে, এটা নিজেই বুঝতে পারে না দিব্যজীবন নামের লোকটা।

* * * *

দুপুর গড়িয়ে বিকেলমুখী হয়েছে। বাড়ির পশ্চিম দিকটায় এখনো রোদের বেশ ঝাঁঝ, তবে পুব দিকটা বড় মনোরম। হাওয়া বইছে চমৎকার, উঠোনের গাছের ছায়ার নিচে একটি স্নিগ্ধ শান্তি।

এই দিকটাতেই লাবুর রান্নাঘর ভাঁড়ারঘর কুয়োতলা। যার চারপাশ নতুন সিমেণ্ট বাঁধানো। তকতক করছে বেদীর মতো চওড়া পাড়টা। লাবুর হাতের গুণে বাড়ির সব জায়গাটাই তকতকে পরিষ্কার। কুয়োতলাটা পর্যন্ত শুকনো খটখটে।

এখন আর হাতে তেমন কাজ নেই। সবকিছুই তো সে আগে আগে সেরে রাখে। লাবুর মুখটা একটু শুকনো শুকনো। দু'দিন আগেও লাবু বড় সুখী সুখী ছিল। ঠিক তেমনিটি আর নেই এই দু'দিন। ছেলের ভাবান্তর লাবুকে চিন্তিত করেছে। বিচলিতও।

মিণ্টুকে কনে দেখতে আসার কথা শুনেই ছেলেটা কী রকম যেন বদলে গেল। তবে কী? লাবুর কী এটা আগেই অনুধাবন করা উচিত ছিল? ছিল নিশ্চয়। কিন্তু লাবু সে খেয়াল করেনি। করেনি তার কারণ হয়তো ওদের দু'জনের একেবারে অতি সহজ সাধারণ কথাবার্তা ব্যবহার, এদিকটার দিকে ভাবতে দেয়নি।

লাবু বোকা হলেও, লাবু ভাবল হয়তো ছেলেটা নিজেও জানতো না। টের পায়নি নিজের মনের খবর, হঠাৎ ওই খবরটা ওকে নাড়া দিয়ে জানিয়ে দিয়ে গেল।

কিন্তু এখন কী করা?

লাবু কী তার মান্যগণ্য পাড়াতুতো ভাসুরের বা জায়ের কাছে তার ছেলের জন্যে ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে দাঁড়াবে? তা লাবু ছেলের জন্যে সবই পারে। না হলে প্রবাসদার কাছে চিঠি লিখেছিল কী করে?

কিন্তু পাত্র হাতে দাঁড়ালেই কি ভিক্ষা মিলবে?

তাছাড়া অরুণকে জিগ্যেস না করেও তো যাওয়া যায় না। যদি সে রেগে যায়। যদি বলে ওঠে, 'কী জন্যে গিয়েছিলে তুমি আত্মসম্মান খুইয়ে? তোমার ছেলে ওদের জামাই হবার যুগ্যি?'

তাছাড়া পাড়ার মধ্যে এমন চির-পরিচিত ঘরে বিয়ে। সবাই কি পছন্দ করে? পাড়ার লোকেরা হয়তো গভীর কিছু সন্দেহ করে বসবে।

নানান চিন্তায় অস্থির হচ্ছিল লাবু।

ছেলেকে ভালইবেসেছে লাবু, কোনোদিন ভয় করেনি। হঠাৎ যেন ছেলের সম্পর্কে একটা ভয় ভাব এসে গেছে বেচারার।

কত সাধ করেছিল মনের গভীর গোপনে। আর একটু গুছিয়ে নিতে পারলেই একে ওকে বড়মুখ করে কনে খোঁজার কথা বলবে। একটি শান্ত নম্র সুন্দর মেয়েকে ঘরে এনে তুলবে। ছেলের হাতে তুলে দেবে সে উপহারটি। তাকে আদর করবে যত্ন করবে। বলবে, 'আমার সংসারের কোনো কাজ তোমায় এক্ষুণি করতে হবে না বাপু, শুধু আমার ছেলেটিকে যত্ন করতে শিখতে হবে।'

লাবু তো আর ছেলের বৌকে হিংসে করবে না। আর তাকে শাসন করতেও যাবে না। এইসবই তিল তিল করে ভেবেছে লাবু। এই আকস্মিকতার কল্পনা করেনি কোনোদিন।

মাছে মাঝে ফাগুনের পড়ন্ত বেলার বাতাস গায়ে এসে লাগছে। শরীরটা জুড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মনটা? আহা লাবুর যদি একটা মেয়ে থাকতো। লাবু তার কাছে মনের প্রাণের কথা বলতে পেয়ে বাঁচতো। এই ভাবনার সময় লাবু একটা মেয়েকে দেখতে পেল।

এদিকের অঞ্চলের বাড়ির ধরনই এই। সদর দরজাটা বেশ মজবুত থাকে এবং সব সময় খিল ছিটকিনি লাগানো থাকে। কিন্তু ভিতর বাড়ির দিকটা রান্না ভাঁড়ার উঠোন বাগান কুয়োতলার দিক। এগুলোর জন্যে শুধু বেড়ার দরজা। বা নেহাৎই নাম কা ওয়াস্তে একটা দরজা ঘেরা পাঁচিলের গায়ে থাকে, তো সেটা রাতের আগে আর বিশেষ বন্ধ হয় না। অতএব যে কেউ ওই বাগান উঠোর পার হয়ে চলে আসতে পারে।

আর সব বাড়ি বাড়ি জলের কল আছে। কিন্তু লাবুর শ্বশুর আর সেটা করে উঠে যেতে পারেননি। বিজলী আলোটা এনে দিয়ে গিয়েছিলেন তাই রক্ষে।

তবে জলের কলের জন্যে তেমন কোনো অভাববোধ নেই লাবুর। ব্রজরাণী দু'বেলা এসে চক্ষের নিমেষে কপিকলের সাহায্যে কুয়ো থেকে জল তুলে দুটো চৌবাচ্চায় আর যেখানে যত বালতি ঘড়া থাকে সব ভরিয়ে দিয়ে যায়।

আসবে ব্রজরানী আর একটু পরে।

এখন কে এল।

যে এল তাকে দেখে থতমত খেয়ে গেল বাবু। অথচ আসাটা তার নতুন নয়। যখন তখনই আসে।

লাবুর পাশেই ওই কুয়োর ধারের বাঁধানো পাড়ের ওপর বসে পড়ে মিণ্টু বলল, আপনার এখানটা কী চমৎকার হাওয়া কাকীমা।

লাবু বলল, হ্যাঁ রে। তাই বসে আছি চুপচাপ। হাওয়া খাচ্ছি। তুই এমন সময় বেরিয়েছিস যে?

চলে এলাম!

মিণ্টু উঠে গিয়ে হাত বাড়িয়ে একটা কাঠচাঁপা গাছে ফুটে থাকা থোকা থোকা ফুল থেকে দুটো তুলে নিয়ে এসে বলল, এই ফুলগুলো কী চমৎকার!

আরো নে না।

নাঃ। গাছেই বেশী ভাল লাগছে।

বাড়ির কী খবর?

খবর আবার কী! মায়ের বাতের ব্যথাটা একটু বেড়েছে।

শীত তো চলে গেল। এখন আবার বাত বাড়া কেন! দেখতে দেখতে দিন যায়। গেল ফাগুনে অরুণের চাকরি হলো, আর আবার ফাগুন এসে গেল।

অন্যদিন হলে হয়তো মিণ্টু অরুণের প্রসঙ্গই চালিয়ে যেত।

একদম ডেলি প্যাসেঞ্জার বাবু হয়ে গেল অরুণদা।

অথবা ফিরতে অত দেরি করে কেন অরুণদা? আমাদের বাড়ির সামনে দিয়েই তো ফেরে।

আজ কিছু বলল না।

হাতের ফুল দুটোই যেন দ্রষ্টব্য।

লাবু বলল, চা খাবি?

নাঃ।

কেন রে? আমিও তো খেতাম একটু পরেই।

তা হোক গে। বেশ বসে আছি। এত সুন্দর এখানটা।

লাবু বলল, শোনো কথা মেয়ের। তোদের কত ভাল বাড়ি।

লাবুর মনে হচ্ছিল মিণ্টু যেন কী বলবে বলবে ভাব। সেটাই বলে বসল মিণ্টু।

ভাল হলেই বা কী। বিদেয় করে তো দেবে।

ওঃ। বিয়ের কথায় মন কেমন।

লাবু আস্তে বলল, মেয়ে সন্তান। ঘরে রাখবার তো নয় মা।

মিণ্টু হঠাৎ উঠে দাঁড়াল।

কোল থেকে ফুলের পাপড়ি দু একটা ঝরে পড়ল। মিণ্টু বলে উঠল, তা বলে হাজার মাইল দূরে ছুঁড়ে দিতে হবে এমন কোনো কথা নেই। কাছাকাছিও রাখা যায়, এ চিন্তাই নেই। মায়েরও না কাকীমারও না। আচ্ছা আমি যাই।

লাবু হাত বাড়িয়ে ওর হাতটা ধরে ফেলে গভীর গলায় বলে, মিণ্টু।

মিণ্টু কথা বলে না। ওই কাঠচাঁপা গাছটার দিকেই থাকে ঘাড়টা বাঁকিয়ে।

লাবু বলে, মিণ্টু। আমার কী এত সাহস হবে মা?

মিণ্টু কথা বলে না।

আর কত কথা বলবে? ভয়ানক একটা ঝোঁকের মাথায় চলে এসেছে। ভেবেছে, ঠিক আছে অরুণদা। তুমি বলেছ, এটা নাকি আমারই বলবার। তা তাই বলতে এসেছি।

লাবু আস্তে বলল, মিণ্টু। আমার গরীবের সংসার।

গরীব আবার কী! আহা! আমি যাই।

লাবু তবু হাত ছাড়ে না। বলে, বোস। একটু বোস।

তারপর বলে, মা লক্ষ্মী স্বয়ং ঘরে এলে অবিশ্যি কেউ আর গরীব থাকে না। কিন্তু যদি আমি দিদির কাছে গিয়ে ভিক্ষে চাই। মুখের ওপর হেসে উঠবেন না তো?

মিণ্টু তেমনি বাঁকা ঘাড়েই বলল, ওসব আমি জানি না। আমি যাই।

লাবু বলল, ঠিক আছে। তোকে জানতে হবে না। হাতটা ছেড়ে দিল।

মিণ্টু বলল, আমি কিন্তু আমার এক বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিলাম, কবে পরীক্ষার অ্যাডমিট্ কার্ড দেবে জানতে। মনে থাকবে তো?

লাবু এখন একটু হেসে ফেলে ওর মাথাটা কাছে টেনে বুকে চেপে ধরে বলল, থাকবে। খুব মনে থাকবে।

মিণ্টু চলে গেল।

আমি যাব। কালই যাব।

লাবু মনে মনে বলল, ওহে অরুণবাবু আর আমি তোমায় ভয় পাই না।

একটা অসহায় হৃদয় যদি কারো কাছে আশ্রয় নিতে চায় সেই আশ্রয়দাতার মধ্যে বুঝি আপনিই একটা শক্তি সঞ্চয় হয়।

*   *   *   *

ভবেশ ভৌমিকের রোগটা যে হঠাৎ এমন মারমার করে বেড়ে উঠবে, তা সে নিজে আদৌ ভাবেনি। তার ভক্তরাও ভাবেনি।

প্রথম যেদিন ডাক্তার বলেছিল বায়োপসিটা একটু করিয়ে নিলে হয়। দোষ তো কিছু নেই।

সেদিনই ভবেশ বলেছিল আমার কাছে আর লুকোতে হবে না রে বাবা। বুঝে ফেলেছি ফাঁসির হুকুম হয়ে গেছে। তবে হাইকোর্ট সুপ্রীম কোর্টের ধর্ণা দিয়ে মামলা লড়তে লড়তে যে কটা দিন চালিয়ে যাওয়া যায়। ঘাবড়াবার কিছু নেই। কাজ করে যাব।

আগামীকাল হাসপাতালে নিয়ে যাবে এরা।

আজ ভবেশ সবাইকে ডেকেছিল।

বলল, আমার নতুন স্কীমটা হচ্ছে, সবাই মিলে গাদাগাদি করে একই সেণ্টার থেকে কাজ না করে এক একজন আলাদা আলাদা সেণ্টার গোছের খুলে কিছু কর্মী যোগাড় করে নে। মেয়েগুলোর ওপর অবশ্য তেমন ভরসা নেই। বাড়ির চাপে বিয়ে করে ফেলতে হয়। তবে সৌম্য, গৌতম, অরবিন্দ, শ্যামল, মণ্টু, শচীন তোরা তো আছিস। থাকবি। এই ঘরটাই তোদের হেড্ অফিস থাকবে। দেখিস তা বলে যেন ভবেশ ভৌমিকের একখানা এনলার্জ ফটো দেয়ালে ঝুলিয়ে রেখে তলায় লিখে রাখিসনি 'ভবেশদা! তোমায় আমরা ভুলব না।'

আঃ, ভবেশদা। এসব কী হচ্ছে?

গৌতম প্রায় ধমক দিয়ে বলল, গোটাকতক 'রে' দিলেই খানিকটা সামলে যাবেন। তারপর ঠাকুরপুকুরে কিছুদিন—

ও বাবা। এই রাজসূয় যজ্ঞের খরচটা আসবে কোথা থেকে শুনি?

খরচ লাগবে না।

থাম। বাজে কথা রাখ। ব্যাটা ভবেশকে আরো কিছুদিন টেনেটুনে পৃথিবীতে ধরে রাখবার জন্যে মেলাই খরচা করার দরকার নেই। সে টাকাটা বরং ওদের জন্যে খরচ করবি। বলি শোন—

ভবেশ একটু থেমে বলে, কর্মী যোগাড় করবি ওই বস্তি থেকেই। হেলায় ফেলায় ঘুরে বেড়ানো ছেলেগুলোকে একটা মহৎ কাজ দিলে দেখবি কী উৎসাহ পাবে! নিচের তলায় পড়ে থাকাদের 'ভাল' করতে চাইনে, ওপর থেকে শুধু করুণার হাত বাড়ালেই চলবে না। ওদের ভিতর থেকেই শক্ত হাত গড়ে তুলে—

আঃ, ভবেশদা।

ব্রততী বলল, এবার কিন্তু আমরা রেগে যাব। এত বেশী কথা বলবেন না।

ভবেশ ক্লান্তিতেই চোখটা বুজল।

তারপরই বলে উঠল এই তোরা চা খেলি না?

আজ থাকগে।

থাকগে কী রে? বল বল। আমিও তো খাবো। তোদের সঙ্গে একসঙ্গে—

পরদিন চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হসপিটালে নিয়ে গেল এরা ভবেশকে। ভর্তি করে দিয়ে এলো।

একটা মাত্র ভিজিটার্স কার্ড পাওয়া যাবে। একজন করে মাত্র আসতে পারবে।

গৌতম বলল, ওটা আমার কাছেই থাক। কাল আমিই আসব।

গৌতমের কথায় কেমন যেন একটা অধিকার বোধের স্বর।

বাকিজনেদের ভাল লাগে না।

ব্রততীর তো খুবই খারাপ লাগে।

গৌতম তার ডাক্তার জামাইবাবুকে ধরে ব্যবস্থাটা করে ফেলেছিল বলেই কী?

অদ্ভুত একটা নিঃসঙ্গতার মধ্যে দিন কেটে যাচ্ছে প্রবাসজীবন নামের লোকটার। টেনেটুনে সংসারের সঙ্গে যেটুকু যোগসূত্র রাখছিলেন, সেটুকুও ক্রমশঃ ছিঁড়ে যাচ্ছে।

ডাক্তারের আদেশে সকাল বিকেল একটু হাঁটতে বেরোন প্রবাসজীবন। সঙ্গে দেবু থাকে। তিনি না রাখতে চাইলেও ও ছাড়ে না।

প্রবাসজীবন বলেন, বাড়িতে কাজকর্ম ফেলে—কী দরকার। আমি তো আর গাড়ি ঘোড়ার রাস্তায় হাঁটতে যাচ্ছি না। ফুটপাথ ধরে ধরে পার্কে চলে যাব।

দেবু বলে, বাড়িতে এখন কোনো কাজ নেই।

কাজ নেই? বলিস কী? গেরস্ত তোকে অমনি অমনি পুষছে? হা হা হা।

পার্কে চলে আসেন।

কিন্তু বসার মতো পরিবেশ কী আর আছে পার্কে? বসবার মতো

একটাও আস্ত বেঞ্চ?

এখানে সেখানে কতকগুলো বাজে ছেলের জটলা। কিন্তু উপায় কী?

আর কোথায় যাবেন? বসতে তো একটু হবেই।

একটা পায়া লড়বড়ে মরচে ধরা চেঞ্চ। দেবু খানকতক ইট ঠেকিয়ে তার পায়া শক্ত করে রেখেছে। দেবু সঙ্গে করে দু'খানা বাসি খবরের কাগজ নিয়ে আসে। পেতে দেয় বেঞ্চের ওপর।

প্রবাসজীবনের হঠাৎ হঠাৎ মনে হয়, এ পৃথিবীতে দেবুই বোধ হয় তাঁর একমাত্র আপন। দেবু ছাড়া তাঁর কথা বলবার লোক আর কোথায়? তাও বাড়িতে সেটা চলে না। 'চাকর-বাকরের' সঙ্গে গাল-গল্প করা? ছিঃ। প্রেস্টিজ বলে একটা জিনিস নেই? ওদের সঙ্গে প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি শব্দও ব্যবহার করে না চৈতালী। এবং আর কেউ সেটা করলে, খুব অবজ্ঞার চোখে দেখে।

প্রবাসজীবন তাই পার্কে এসে বলেন, তোদের মাকে তোর মনে আছে দেবু?

মাকে মনে নাই? কী যে বলেন বাবু!

তোকে খুব ভালবাসতেন।

তা আর জানি নে। এয়েছিলুম তো ছোটবেলায়, তো মা ঘরের ছেলেপুলের মতো শুধোতো কীরে দেবু খিদে পেয়েছে? একবার ইয়া বড় বড় আম এলো, ফজলি আম। তো আমি বলেছি, 'উরেব্বাস কী পেল্লায় আম রে বাবা! বালিশের বদলি মাথায় দে শোওয়া যায়।' শুনে মায়ের কী হাসি। তা'পর সব থেকে পেল্লায়টা আমার হাতে দিয়ে বলল, নে। তাহলে মাথায় দিয়ে ঘুমোগে যা। খিদে লাগলে কোণ কামড়ে কামড়ে খাবি। হাসি ছাড়া কথা ছিল না।

দেবু! আমি যতদিন আছি, এ বাড়ির কাজ ছেড়ে চলে যাবি না তো?

দেবু জোরের সঙ্গে বলে, আপনার তরেই নেগে পড়ে পড়ে আছি বাবু। নইলে মাঝে মাঝে তো মন হয় দুর হোক গে, চলে যাই।

প্রবাসজীবন চুপ করে যান।

এই খাতে আলোচনা চালানো খুব নিরাপদ নয়। কিন্তু দেবু উসখুস করছে।

একটা কথা বলছিলুম বাবু।

কী রে?

দেবু মাথা চুলকে বলে, আমার মাটা তো ক্ষ্যাপা বললেই হয়। যা ধরে তা মোক্ষম ধরে। এখন খোট্ ধরেছে ছেলের বে দেবে।

ছেলের! মানে কোন ছেলের? তোর না-কী?

ওই তো কথা।

প্রবাসজীবন অনেক দিন পরে একটু গলা খুলে হেসে ওঠেন।

হা হা হা। তোর এখনি বিয়ে কী রে? কত বয়েস তোর?

তা মেঘে মেঘে হয়েছে কিছু। চব্বিশ পার হয়েছে।

দূর! আজকাল এ বয়েসে কেউ বিয়ে করে না।

প্রবাসজীবন যে ছেলেটাকে এমন নিরুৎসাহজনক কথা বললেন, সে কী শুধুই 'আজকাল'-এর নিয়ম দেখাতেই? দেবুর ওই বিয়ের কথাটা শুনেই প্রবাসজীবনের বুকটা কী ধুক করে ওঠেনি? তখুনি মনে হয়নি, যাঃ। ছেলেটা তাহলে এখন কিছু কালের মতো হাওয়া হয়ে যাবে। এই নিত্য খেলার হাটটি যাবে ভেঙে।

সেই প্রবাসজীবন। যিনি একদা একখানা বড় অফিসের কেষ্টবিষ্টু লোক ছিলেন। লোকে 'সেন সাহেব' বলে তটস্থ হতো। আর যিনি একদা কেয়াতলার ওই বড়সড় সুন্দর বাড়িটি বানিয়ে ছিলেন কেবলমাত্র স্বোপার্জিত অর্থে।

অবসর গ্রহণের পরও যার বাড়িটি সর্বদাই বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-জনের কলকল্লোলে মুখর থাকতো।

সেই প্রবাসজীবন।

একটা 'ভৃত্য মাত্রের' বিরহ আশঙ্কায় ব্যাকুল হলেন।

দেবু অবশ্য ওই ব্যাকুলতাটা ঠিক বুঝল না। বলল, আমাদের গ্রামে ঘরে সাত সকালে বে হওয়াই রেওয়াজ। তাছাড়া—মা এখন

টাকার লোভে নেচেছে।

টাকার লোভে? কিসের টাকা?

হ্যাঁ তো!

দেবু মুখটা একটু নিচু নিচু করে লজ্জা লজ্জা গলায় বলে, কেন, পণের টাকা! কাকা এয়েছিল, বলে গেছে পাত্রীপক্ষ আট হাজার টাকা পণ দেবে। না পারলে দু বিঘে ধান জমি লিখে দেবে। তবে মা কাকা নগদের জন্যে চাপ দিচ্ছে।

প্রবাসজীবন হতবাক্ হয়ে বলেন, নগদ আট হাজার টাকা পণ দিয়ে তোর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে? বলিস কী?

দেবু এই প্রশ্নবাণে একটু আহত হয়। হয়তো অপমানিতও।

বলে, দেবে না কেন? লোকে তো আরো বেশী বেশীই পায়। আমার জ্যাঠাই তো ছেলের বে-তে দশ হাজার পেয়েছিল। আবার পিসি মেয়ের বিয়ে দিল বারো তেরো হাজার খরচ করে।

প্রবাসজীবন যেন একটা অজানা জগতের কথা শুনছেন। পণ দেওয়া-দিয়ির ঘটনা অবশ্যই অজানা নয়। তার বহুবিধ ফলাফলও অজানা নয়। কিন্তু দেবুর মতো ঘরে! লেখাপড়া না জানা একটা গৃহভৃত্য মাত্র। তার এত দর।

আস্তে বললেন, তোদের ঘরে এত টাকা আছে?

দেবু অগ্রাহ্যের গলায় বলে, আমাদের ঘরে কি আর আছে? থাকলে কি আর বাপ মরতেই কাকা বছর আষ্টেকের ছেলেটাকে শহরে নিয়ে এসে বাবুদের বাড়িতে কাজে লাগিয়ে দিতো?

জমি ছিল কিছু তো বোন দুটোর বে'তেই তো ফুটে গেছে। মা এতদিন সুদিনের আশায় দিন গুনছিল।

প্রবাসজীবনের মনে পড়ল, বোনের বিয়ে বাবদ ছুটি নিয়ে দেশে গিয়েছিল দেবু।

কিন্তু তখন কী প্রবাসজীবন এমন অসহায় বোধ করেছিলেন?

প্রবাসজীবন বললেন, আর তোর ওই পিসিমা না কে? বললি, বারো চোদ্দ হাজার—

সবই ওই জমির কারবার বাবু। পিতৃপুরুষরা রেখে গেছল, তাই ভাঙিয়ে ভাঙিয়ে খাচ্ছে। জমির দরও তো দিন দিন হু হু করে উঠছে। বিঘের দামে কাটা বিকোচ্ছে।

প্রবাসজীবন বললেন, আমরা ধারণা ছিল,গ্রামেট্রামে চাষীদের ঘরে মেয়ের বাপই টাকা পায়। ছড়াতে আছে, কনের মা কাঁদে, টাকার পুঁটুলি বাঁধে। তো—

সে আগে ছিল। এখন বদলে গেছে। একটু বিদ্যেসাধ্যিওলা ছেলে হলে তো কথাই নাই। বিশ হাজার হাঁকবে। তার ওপর সাইকেল ট্র্যানজিস্টার—প্রবাসজীবন একটু উত্তেজিত গলায় বললেন, আর দিতে না পারলে বৌটাকে মেরে ফেলবে? কেমন?

দেবুর বিদ্যেসাধ্যি নেই, তা বলে কথায় হারবে, এমন নয়। বেজার গলায় বলে, সে তো বিদ্বান পণ্ডিত পয়সাওলাদের ঘরে আরো বেশী। বৌ মেরে ফাঁসির হুকুম হয়। আবার পয়সার জোরে খালাস পেয়ে গিয়ে বুক বাজিয়ে বেড়ায়।

প্রবাসজীবন যেন হঠাৎ ভারী আশ্চর্য হয়ে গেলেন। এদের এদিকটা তো কখনো দেখেননি প্রবাসজীবন। এই দেবু ভূষণ অথবা ওদের মতনদের।

এরা খবরের কাগজ পড়ে না। অনেকে হয়তো বা নিরক্ষরই, কিন্তু 'সমাজপ্রবাহ' সম্পর্কে টনটনে জ্ঞান।

উঠে পড়লেন।

দেবু বলল, আর বসবেন না?

নাঃ, আকাশটা কেমন ঝড় ঝড়। তো কবে যাবি দেশে?

কাকা তো বলে গেল, সামনের মাসের মাঝামাঝি। এখন তো চৈত্তির চলছে। বোশেখের মাঝ নাগাদ।

প্রবাসজীবনের মনে হল কী যেন একটা সম্পত্তি তার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। ভূষণ সম্পর্কে ততটা সম্পর্কিত নন প্রবাসজীবন। সে বিবাহিত। মাঝে মাঝেই দেশে যায়। তখন দেবুই রান্নাঘরের ভারপ্রাপ্ত হয়, তাই টের পান। দেবুর রান্না আর আর যাই হোক

প্রশংসনীয় নয়। ভূষণ ভাল রাঁধিয়ে। তবে ভূষণ প্রণতি চলে যাবার পর কিছুদিন একটু ভাসমান থেকে বড় গাছে নৌকো বেঁধে ফেলেছে।

ভবেশ ভৌমিকের শেষকৃত্য সেরে এসে এরা ভবেশের সেই ঘরে গিয়ে বসল। বাড়িটা ভবেশ তাঁর 'শিশুকল্যাণ' কাজের জন্য উৎসর্গ করে গেছে। এদের ট্রাস্ট করে গেছে। ওরকম আলাভোলা উদোমাদা মানুষটার মধ্যে একরকম নিপুণ একটি বুদ্ধিও তো ছিল।

ঘরটায় যেন এখনো ভবেশের উপস্থিতি বিরাজ করছে। সেই লুঙ্গি আর হাফ-হাতা খাটো পাঞ্জাবি পরা কাদাগোঁচা চেহারার লোকটা, যার কথাবার্তা আরো কাদাখোঁচা, খিঁচিয়ে ছাড়া কথাই বলতে জানতো না, তার জন্যে এতগুলো শিক্ষিত মার্জিত সভ্য সুন্দর ছেলে-মেয়ে এমন হাহাকার অনুভব করছে। এই এক আশ্চর্য!

সুকুমার আস্তে বলল, ভাবা যাচ্ছে না।

ঠিক।

অত্রী বলল, এতদিন হসপিটালে গিয়ে গিয়ে দেখে এসেছি। মনে হতো যেন অন্য আর কেউ। চলে গেলেন, তাও যেন ঠিক বুঝতে পারিনি। এখন এখানে এসে অনুভব করতে পারছি—

চুপ করে গেল। মাথাটা নিচু করল।

গৌতম বলল, শেষের দিকে যা যন্ত্রণা পাচ্ছিলেন দেখে মনে হয়েছে নিজেদের স্বার্থে আরো কিছু দিন বাঁচিয়ে রাখায় চেষ্টাটা বোধ হয় অমানবিকতা।

ক'দিন আগে সক্কলের হাত ধরে ধরে বলে গেছেন, 'তোরা রইলি। তোদের মধ্যে আমি থাকব।'

সেই মানুষের চোখে জল। ভাবা যায় না।

ব্রততী বলল নিঃশ্বাস ফেলে, যারা নিজে অনেস্ট, যারা খাঁটি তারা বিশ্বাস করে অন্যরাও বুঝি তেমনি। কিন্তু আমরা কী তাই? আমরা কী রইলাম?

সৌম্য দৃঢ় গলায় বলল, থাকতেই হবে। ঠিক যেমন ভাবে চলছিল সেইভাবেই চালাতে হবে।

কিন্তু ভবেশ ভৌমিক হাসপাতালে আশ্রয় নেবার পর থেকে কী ঠিক তেমনভাবে চলছিল? সকলের মধ্যেই এসে গিয়েছিল একটা অবলম্বনশূন্য হতাশা ভাব। মনের মধ্যে একটা শিথিলতার ক্লান্তি।

ছবি বাঁধিয়ে দেওয়ালে টাঙিয়ে গলায় মালা ঝুলিয়ে স্মৃতি পূজা। সেটা হবে না। মনে পড়ে যাবে ভবেশদার বিদ্রূপ রঞ্জিত অসুন্দর মুখটা।

তাছাড়া ছবিই বা কোথায়?

একবার সবাই মিলে বস্তির কিছু ছেলেমেয়েকে নিয়ে দমদমে কাদের যেন বাগানে চড়ুইভাতি করতে যাওয়া হয়েছিল, সেখানে একটা সমবেত ফটো তোলা হয়েছিল।

আর কই?

ছবির একটা দরকার ছিল।

ছবি থাকলে বছরে বছরে এক দু'বার (জন্মদিন এবং মৃত্যুদিন) করে সেই ছবির সামনে ফুলের তোড়া বসিয়ে ধূপের কাঠি জ্বালিয়ে —ভাবগম্ভীর কণ্ঠে গাওয়া হতো। কোন আলোকে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আসো—

নিরলম্বশূন্যতায় স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখা কঠিন।

মানুষ বড় শক্তিহীন।

বাবা! আপনি দেবুকে একমাসের জন্যে ছুটি দিয়ে দিয়েছেন?

উত্তেজিত দিব্যজীবন বাবার ঘরে এসে ঢুকল। দিব্য যখনি এঘরে আসে, তখনি এভাবেই আসে।

প্রথম প্রথম কারণটা বুঝতে পারতেন না প্রবাসজীবন। ভাবতেন সব সময় এমন রেগে থাকে কেন দিব্যটা। ক্রমশ বুঝতে পেরেছেন এটা হচ্ছে একটা নার্ভাসনেস। অপরের প্রেরণায় অথবা সত্য বললে, প্ররোচনায় নিজের প্রকৃতির বিরুদ্ধে কোনো কিছু করতে হলে এই অবস্থা হয় মেরুদণ্ডহীন ছেলেগুলোর।

তবু প্রবাসজীবন অবাক হলেন।

বললেন, আমি ছুটি দিয়ে দিয়েছি ?

দেননি বলছেন ?

কী আশ্চর্য। আমার দেওয়াদিয়ির কী আছে ? বলল, মা বিয়ে দিতে জোর করছে না গেলে চলবে না। তো শুনে মাইনেটাইনে দিয়ে দিলাম। তোমাদের কিছু বলেনি ?

বলবে না কেন বলেছে ? 'কাল যাচ্ছি।' সংসারের সুবিধে অসুবিধার কথা না জেনে আপনি যদি মাইনে মিটিয়ে দিয়ে থাকেন, ও তো সাপের পা দেখবেই।

প্রবাসজীবনের মুখে আসছিল, তো ও যদি বিয়ের জন্যে ছুটি চায় তোমার 'সংসারের অসুবিধে' বলে আটকাতে পারবে? মহা মহা অফিসেও এমন আইন নেই। ছুটি দিতে বাধ্য।

কিন্তু মুখে এসে যাওয়া কথাকে বুকের মধ্যে চালান করে ফেলবার ম্যাজিকটি প্রবাসজীবনের খুবই রপ্ত হয়ে গেছে।

তাই বললেন, তোমাদের বলেনি। চৈতালীকে বলেনি কী আশ্চর্য। আমি তো এত জানি না বাবা!

সংসার সম্পর্কে আপনি আর কতটুকু খোঁজ রাখেন।

দিব্য আরো উত্তেজিত গলায় বলে, এদিকে ঠিক ওই সময়ই ভূষণ তার বোনের বিয়ে বলে আগে থেকে ছুটি নিয়ে বসে আছে। তার মানে চৈতালীর মৃত্যু।

প্রবাসজীবন তবুও তো বলে উঠতে পারেন না, তো তোমাদের ভূষণ যে ছুটি নিয়ে বসে আছে, সেটা তো আমাকে জানাওনি বাপু।

বলে উঠতে পারলেন না, বাড়ির মালিকানীর 'মৃত্যু' অবধারিত মনে হলে কারো বোনের বিয়ের ছুটিটা বোধ হয় বাদ দেওয়া যেতে পারে দিব্য।

কিছুই পারলেন না। বেচারী বেচারী মুখে অসহায় গলায় বললেন, তাই তো, কী মুস্কিল! এত সব তো জানি না।

আর ভাবতে লাগলেন মাইনেটা যখন মিটিয়ে দিয়েছিলাম দেবুকে, তখন কি ওরা কোনোখান থেকে দেখেছিল না কী ? মাইনের ওপর

বিয়ের খরচ করিস বলে বাড়তি একশো টাকা দিয়েছিলেন সেটাও তো তাহলে দেখেছিল।

নাঃ, তা বোধহয় দেখেনি। দেখলে কী আর সে কথা না তুলতো? রক্ষে রাখতো প্রবাসজীবনের?

তবে ভয় হয়। নিজের ঘরে বসে প্রবাসজীবন কখন কী করেন, কখন কার সঙ্গে কী কথা বলেন, কখন কাউকে টুকটাক কিছু দিয়ে ফেলেন, সবই যে ওরা কেমন করে টের পেয়ে যায়। পরে হঠাৎ হঠাৎ উল্লেখ শোনেন তার।

যেমন কাটুম কাটাম এসে হি হি করে বলে, দাদু গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ওই বুড়োটাকে কী দিলে তুমি?

এই দ্যাখো! কী আবার দেব?

হি হি দেখেছি! দেখেছি। টাকা দিয়েছ! দশ কুড়ি টাকা। ও তো ভিখিরি। ভিখিরিকে কেউ অত টাকা দেয়? শুধু তো দশ কুড়ি পয়সা দিতে হয়। তুমি একটি বোকা! বোকা!

আর সেই একদিন!

কত সন্তর্পণেই নিজের গায়ের শালের মধ্যে মুড়ে একখানা পুরনো র‍্যাপার নিয়ে গিয়ে পার্কের সেই ধুঁকে বসে থাকা হাড়জিরজিরে আধ-পাগল লোকটাকে দিয়েছিলেন। সেদিন দেবুও সঙ্গে যায়নি। কে জানতো ভূষণটা ঠিক সেই সময় কোথা থেকে আসছিল ওই পার্কের পাশ দিয়েই।

পরদিন দিব্যর মুখে শুনতে হল, বাড়ির জিনিস আপনি যাকে ইচ্ছে দিতে পারেন বাবা। তবে লুকিয়ে না দেওয়াই ভাল। ওতে 'লোকজনে'র কাছে প্রেস্টিজ থাকে না।

প্রবাসজীবন মরমে মরে গিয়ে বললেন, লুকোনো আবার কী! ওই পাগলটাকে দেখি আর মায়া হয়। রোজই ভাবি, আলমারির মধ্যে পুরনো র‍্যাপারট্যাপার তো পড়ে টড়ে আছে, পোকায় কাটছে। লোকটাকে দিলে—প্রয়োজনের অতিরিক্তই কথা বলে ফেলেন প্রবাসজীবন।

দিব্য বলল, থাক আমাকে এত কৈফিয়ৎ দেবার দরকার নেই। তবে বাড়িতে আরো পুরনো গোছের জিনিস ছিল, সেটা দেওয়া যেত। ওটা ভূষণ গায়ে দিতে পারতো। ওকে তো শীত বলে একটা চাদর দিতে হল।

প্রবাসজীবনের বলবার ক্ষমতা নেই, 'আমার একটা পুরনো জিনিস, তাও কাউকে হাতে করে দিয়ে দেবার অধিকার নেই আমার? কেন? কেন?'

বলতে পারেন না। প্রবাসজীবনের মনে হয় তাঁর পায়ের তলায় মাটি নেই। জোরে পা ফেলতে গেলেই ঝুরো বালিতে পা ডুবে গিয়ে গহ্বরে তলিয়ে যাবেন।

এমন কী এ প্রশ্নও করে ফেলতে পারেন না, শীত বলে চাদর দিতে হয়েছে ভূষণকে, কই দেবুকে তো দেওয়া হয়নি?

প্রবাসজীবন শুধু ভ্যাবলার মতো বলেন, আরো পুরনো কিছু ছিল না কী? ইস আগে জানলে—তবে পাগলটা খুব খুশী।

তা হবে না কেন? অল-উল একটা চাদর পেয়ে গেল। আপনার গায়ের এই কাশ্মীরী শালখানা পেলে আরো খুশী হতো।

ব্যঙ্গ। সব সময় অদ্ভুত একটা ব্যঙ্গের ভঙ্গি। ওই ভয়েই প্রবাসজীবনের সাহস হরে গেছে ন্যায্য কথা বলবার। বললে, আরো তীক্ষ্ণ হবে। আরো হুল ফোটাবে।

এও হয়তো মনোবিজ্ঞানীর সমীক্ষা যোগ্য। নিজে এক জায়গায় অনবরতই হতমান্য হয় বলেই হয়তো অপর কাউকে হতমান্য করতে পেলে রিলিফ পায়।

অথচ কতদিন যেন আগে প্রবাসজীবন বলেছিলেন তোমার শাশুড়ীর এই আলমারিটা একবার খুলে দেখতো চৈতালী। পুরনো পুরনো কিছু আটপৌরে শাড়ি বোধ হয় পড়ে পড়ে দিস্তে ধরছে। যদি গরীব মেয়েটেয়েকে দিয়ে দেওয়া যায়। আলমারির মাথাতেই চাবিটা আছে।

চৈতালী এক পাও না এগিয়ে বলেছিল, আমি আর কী খুলব।

আপনিই দেখে রাখবেন কোনো সময়। কাউকে দিতে ইচ্ছে হলে দেবেন।

এই পাথরের দুর্গের দেওয়ালে কোথায় কোনখানে দরজা আছে, জানা নেই প্রবাসজীবনের।

নিজের তৈরি এই বাড়ি নিজের হাতে গড়া এই সংসার যেন কারাগারের মতো লাগে মাঝে মাঝে। মনে হয় অন্যত্র কোথাও চলে গেলে কেমন হয়?

কিন্তু একা কোথায় যাবে একটা হার্টের রোগী এই বয়সে?

জীবনে কখনো সাধুসন্ত মঠ মিশন তীর্থস্থান ইত্যাদির সঙ্গে কোনো যোগসূত্র নেই। কিছুদিনের জন্যও অন্তত কোথাও গিয়ে থাকা সম্ভব কিনা জানেন না। যাদের তেমন কিছু থাকে গুরু আশ্রমটাশ্রম গোছের, তাদেরও তবু বোধহয় হঠাৎ বেরিয়ে পড়বার একটা জোর অথবা যুক্তি থাকে। প্রবাসজীবনের কিছু নেই।

অথচ এখন প্রবাসজীবনের আপন জীবনকেন্দ্রে নিজেকে 'প্রবাসী' লাগে। এই গণ্ডিটুকুর মধ্যে কে যেন বেঁধে মারে।

ইদনীং মাঝে মধ্যে ভাবতেন, আচ্ছা দেবুটাকে নিয়ে পুরীটুরী কোথাও ঘুরে আসা যায় না? ওসব জায়গায় তো থাকার জায়গার অভাব নেই।

কিন্তু কথাটা তুলবেন কী ভাবে, এই ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ বিদায়ের বাজনা বেজে উঠল। দেবু বিয়ে করতে চলে গেল। দেবু আর প্রবাসজীবনের থাকল না।

খুড়ির বোনপোর সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ হেসে উড়িয়ে দেওয়ায় সংসারের পরিস্থিতি আর একটু ঘোরালো হয়ে গেছে।

খুড়ি দালানের মাঝখানে ইঁটের পাঁচিল না তুললেও হঠাৎ দালানের মাঝখানে একটা দড়ি টাঙিয়ে সেইখানে এমনভাবে ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে শাড়ি ধুতি বিছানার চাদর শুকোতে দিচ্ছে যেটা পার্টিশান ওয়ালের কাজই করছে কতকটা।

সক্কাল বেলা ঝুলিয়ে দেয়, আর. সন্ধ্যের পর তোলে। এপক্ষে সপক্ষে কারো সঙ্গে কারো চোখাচোখিটা সহজে হয় না।

বৃষ্টির দিনে ছাড়া দালানে কাপড় শুকোনোর কথা আবার কে কবে ভেবেছে?

ব্রততী প্রথম যেদিন এটা দেখল এসে, সেদিন ভবেশদার খুব বাড়াবাড়ি অবস্থা। কী ব্যাপার খেয়াল করল না। এদিকে তাহলে দুপুরে বৃষ্টি হয়েছে?

শরীর মন দুইই ক্লান্ত, মাকে জিগ্যেস করাও হয়ে উঠল না। কিন্তু পরপর কদিনই এরকম দেখে একদিন বলল, মা ব্যাপারটা কী? এখানে এসব শুকোতে দেওয়া হচ্ছে?

জিগ্যেস করল।

কিন্তু এতদিন যাবৎ কি এটাই লক্ষ্য করেছে, মাও গম্ভীর থমথমে! যতটুকু না হলে নয় ততটুকু ভিন্ন কথা বলে না।

অর্থাৎ মাও মেয়ের ওপর যথেষ্ট বিরূপ হয়ে গেছে।

কত সহজে একটা ভীষণ কষ্টকর জটিল সমস্যার সমাধান হতে পারতো, তুমি অহঙ্কারী মেয়ে সেটা একেবারে নস্যাৎ করে দিলে? বিয়ে তুমি করবে না? চিরকাল বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে ঘুরে সমাজ-সেবা করবে? কার খপ্পরে যে পড়েছ ভগবান জানে। সমাজসেবা করবার আর অন্য পথ নেই? নোংরা পচা বস্তির মধ্যে ঢুকে ঢুকে। ছিঃ।

মেয়ের এই কাজটা কোনোদিনই মনেপ্রাণে সমর্থন করে না সুনীলা। কিন্তু মেয়ের ভয়ে তেমন কিছু বলতেও পারে না। এখন হঠাৎ সুনীলার মধ্যে একটা বিদ্রোহ এসেছে। এত কিসের ভয়? আর আমি তোমার খোসামোদে যাচ্ছি না। রাঁধছি বাড়ছি খাও দাও। ব্যাস! হেঁই হেঁই করে কথা কইতে যাবার দরকার নেই।

ভবেশদার চিন্তায় ব্যস্ত ব্রততী মায়ের এই ভাবান্তর তেমন লক্ষ্য করেনি। মা'র থমথমে ভাবটার কারণ স্বরূপ কাকা খুড়িকেই ভেবেছে।

আজ হঠাৎ মায়ের তীক্ষ্ণ উক্তিতে একটু চমকালো। মা বললো, বুকের ওপর দেওয়াল তুলতে পারতো। তোলেনি, সেটাই ভাগ্যি।

ব্রততী মায়ের মুখের দিকে তাকাল। কিছু বলল না। স্নানের ঘরের দিকে পা বাড়াল।

কিন্তু এখন সুনীলা একটু নাড়া খেয়েছে। এতদিনের জমানো দীর্ঘশ্বাস আর একপক্ষে কথা কয়ে চলা অনুক্ত কথাগুলো প্রবল উচ্ছ্বাসে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

সুনীলা তাই বলে উঠল, এতোটা অপমান হজম করেও যে তোমার কাকা বাড়ি ভাগ করবার মামলা ঠোকেনি এই ঢের।

ব্রততী তোয়ালেটা হাতে জড়াতে জড়াতে বলল, অপমান করাটা তো ওনাদেরই একচেটিয়া ছিল মা। আর তোমার ছিল নীলকণ্ঠ শিবের তুল্য হজম শক্তি হঠাৎ পালা বদলালো কখন?

কখন? বলতে একটু আটকাচ্ছে না? কাকা খুড়ি মান খুইয়ে বড়মুখ করে অমন ভাল একটা সম্বন্ধ দিল। তুমি একেবারে হ্যানস্থা করে উড়িয়ে দিলে। মুখ দেখাদেখি করতে চায় না বলেই চোখের সামনে পর্দা ঝুলিয়েছে।

অ্যাঁ, এই ব্যাপার!

হঠাৎ ভারী হাসি পেয়ে গেল ব্রততীর। কী ছেলেমানুষি! কী ছেলেমানুষি! এদের ওপর আবার রাগ!

সুনীলা রাগের গলায় বলল, হাসলি মানে?

হাসলাম মানে হাসলাম।

জানি আমি তোমার হাসির পাত্র। তবে আমার কথাটাও ভাবতে হবে তোমায়। আমিও একটা মানুষ। সর্বদা বেঁধে মারা অবস্থায় আছি। কপালটাই এই। কাকে আর দোষ দেব। তিনি অসময়ে চলে গেলেন আমায় অকূলে ভাসিয়ে। বাড়িতে সর্বদা বিরোধীপক্ষের মধ্যে বাস। নিজের পেটের সন্তান সেও দুরস্থ দূর। একটা মেয়ে

সন্তান থেকেও মানুষের ভাঙা সংসার গড়ে ওঠে। এতদিনে জামাই বেয়াই নাতিপুতিতে বুকভরা হয়ে উঠতো। তা নয় মেয়ে—

চুপ করে গেল অদম্য জলোচ্ছ্বাসে।

ব্রততী স্নানের ঘরে চলে গেল।

কল খুলে নিজেকে জলের তলায় ছেড়ে দিয়ে ভাবতে থাকল দোষ দিয়ে লাভ কী? মা যদি বড্ড বেশী সাধারণ সাধারণই হয়, সেটা তার সৃষ্টিকর্তার দোষ।

হ্যাঁ। বড় বেশী সাধারণ মা।

মায়ের কাছে ব্রততীর কোনো প্রত্যাশা নেই।

ভাবতে ভাবতে ভবেশদা। ভবেশদাকে ভাবতে ভাবতে সৌম্য।

আজ সৌম্য বলেছে, ভবেশদা তো চলেই যাচ্ছেন। আমাদের কী হবে বল তো?

ব্রততী বলেছে, জানি না। ভাবতে পারছি না।

এই ধরনের মানুষরা পৃথিবীতে বেশীদিন থাকেন না কেন বল তো?

কি জানি? মনের মধ্যে বড় শূন্যতা অবভব করছি।

কিন্তু এ তো কতদিন যেন আগের কথা।

এখন তো ভবেশ ভৌমিক নামের মানুষটা আর নেই।

সৎকার শেষে যেদিন ব্রততী অন্যদিনের থেকে আরো অনেক বেশী রাত করে ফিরেছিল মা দরজার সামনে বসেছিল, পাছে পূর্ণেন্দু দরজা খুলতে আসে।

অতএব দরজা খুলল সুনীলাই।

ব্রততী খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে এসে দুহাত জোর করে চাপা কান্নার গলায় বলল, এখন কিছু বোলো না মা। একটু দয়া করো।

মা থমকে গেল।

তারপরই মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, চলে গেলেন।

আর কোনো কথা বলল না সুনীলা।

ব্রততীর মায়ের কাছ থেকে এই স্বরের প্রত্যাশা ছিল না। ব্রততী দুহাতে মুখ ঢাকল।

আর এর পর থেকেই সুনীলার সেই মেয়ের সঙ্গে শীতল কঠিন ব্যবহারটা বদলালো।

সুনীলার মধ্যে কেমন যেন অপরাধী অপরাধী ভাব।

মেয়ে যার প্রভাবে পড়ে সমাজছাড়া সৃষ্টিছাড়া হয়ে যাচ্ছে, সুনীলা কি মনে মনে সেই লোকটাকে অভিশাপ দিয়েছে কখনো?

ভাঙা মেলায় ভিড় জমে না।

তবু কেউ কেউ নিয়মিত আসে। কাজ কতটা কী হয় কে জানে। তবে যা হয় তা ভবেশদার স্মৃতিচারণ। তবে কাজের মাধ্যমে কেমন যে এক একটা জুটি বেঁধে যায়।

যেন অবধারিত নিয়মেই গৌতম আর অত্রী একসঙ্গে ঘোরে। ভবেশ ভবনে যে যখনই এসে বসলেও বেরোয় দুজনে একসঙ্গে।

আর, সৌম্য আর ব্রততীরও তো তাইই।

অদৃশ্য এক আকর্ষণে দুজনে দুজনের কাছাকাছি এসে যায়।

একটু একটু আকর্ষণ করবী আর শচীনের মধ্যেও।

সুকুমার নামের ছেলেটার অবশ্য কোনো জুটি নেই, তবু সে নিয়মিত আসে। অদ্ভূত একটা কাজ সে করেছে।

ভবেশের ছবি নেই। সুকুমার উঁচু দেয়ালের পেরেকে ভবেশের একটা পায়জামা আর তার ওপরে সেই হাফ হাতা একটা পাঞ্জাবি ঝুলিয়ে রেখেছে। এসেই তার নিচে একটা ধূপ জ্বালে। ধূপদানি নেই একটা খালি দেশলাই বাক্স তার ধূপদানি।

জ্বেলে তার সামনে চৌকিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলে, বুঝলেন ভবেশদা। কিস্সু হবে না। কিস্সু না। হিসেব করে দেখছি—দেশে রাজ্যে বয়স্ক শ্রমিকের থেকে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা বেশী বৈ কম নয়। এরা ঘরে খাটে বাইরে খাটে। এদের মা বাপ এদের নিষ্ঠুরের মতো খাটায়, এদের আড়কাঠি নৃশংসর মতো খাটায়। যারা বড় বড় কথা বলে, মাইক মুখে দিয়ে বক্তৃতা দেয় এদের দুঃখে বিগলিত হয়, তারাও নিজের বাড়িতে একটা বাচ্চা কাজের মেয়েকে দিয়ে তিনটে লোকের খাটুনি খাটিয়ে নেয়। হ্যাঁ, দেখে আসুন গিয়ে। এক একটা ফ্রক পরা

কাজের মেয়ে এক একটা বাড়িতে রান্না করছে, বাসন মাজছে, সাবান কাচছে, ঘর মুছছে, বাজার দোকান করছে, আর এতটুকু ত্রুটিতে খিচুনি খাচ্ছে। দেখে আসুন। এখন তো আপনার সর্বত্র গতি ভবেশদা, ইচ্ছে করলেই দেখতে পারেন।

সুকুমারের এই পাগলের প্রলাপ শোনেও অনেকে বসে বসে।

মাঝে মাঝে বসে পড়ে সুকুমার। আবার দাঁড়িয়ে ওঠে। অথবা বসে বসেই বলে, বুঝলেন ভবেশদা, কাল হাওড়া বাজারের দিকে গেছলাম। গিয়ে দেখি পুলিশ একটা ঝুপড়ি ভাঙছে। বস্তি উন্নয়ন হবে। পাকাঘর দেবে ওদের। অন্ততঃ ভোটের আগে প্রতিশ্রুতিটা তো দেবে। তো সেই ঝুপড়ি ভাঙা মালপত্তরগুলো কুড়িয়ে বাড়িয়ে মাথায় করে বয়ে নিয়ে গেল বস্তির যত সব বাচ্চারাই। এদের মনে হয় মা বাপ আছে।

আচ্ছা ভবেশদা চেতনা কীভাবে আনা যায় বলুন তো? স্টেজে নেমে গোটাকতক ডায়লগ বলেই ব্যাস চলে গেলেন এখন বলুন নাটকটা জমবে কিসের জোরে?

সুকুমার কী পাগল হয়ে গেছে? তা অবশ্য নয়।

তবে সুকুমার হঠাৎ এই একটা আঙ্গিক ধরে ফেলে ভবেশদাকে শোনাতে গিয়ে কথার নেশায় পেয়ে যায় তাকে। যা বলতে চায় তা বলে চলে। থামতে চায় না।

চা এলে ওকে নাড়া দেওয়া হয়।

সুকুমার চা এসেছে।

সুকুমার হাত বাড়িয়ে ভাঁড়টা ধরে বলে ওঠে, বললুম তো কিস্যু হবে না। এই আমরাও আর এখানে আসব না। কাজে বেরোব না। বলব, ভবেশদাটা একটা পাগল ছিল। তাই দুমুঠো বালি নিয়ে সমুদ্রে বাঁধ দিতে এগিয়ে এসেছিল।

* * *

কদিন ধরে প্রবাসজীবন একখানা চিঠির মুসাবিদা করে চলেছেন। লিখছেন, ছিঁড়ছেন আবার লিখছেন। অতঃপর একদিন সেটা শেষ হলে বললেন, তোদের কাকাই কখন ফেরে রে?

কাটুম হাত উল্টে বলল, একদিন একদিন সন্ধ্যাবেলা একদিন একদিন অনে-ক রাত্তিরে। আমি ঘুমিয়ে পড়ি তখন।

আচ্ছা যেদিন ঘুমিয়ে পড়বি না, সেদিনকে বলিস কাকাইকে, আমার কাছে একবার আসতে।

কাটুমের সবে একটা দাঁত পড়েছে। সেই একটা ভাঙা দাঁতের ফাঁকে মধুর মোহন একটু হেসে বলে, তোমার কাছে আসতে কাকাইয়ের লজ্জা করে।

অ্যাঁ। আমার কাছে আসতে লজ্জা করে? কে বলেছে তোকে একথা?

কাকাই নিজেই বলেছে।

কার কাছে বলেছে?

বাবাইয়ের কাছে, মামণির কাছে, আমার কাছে, সক্কলের কাছে। বলেছে—বাবার ঘরে যেতে আমার লজ্জা করে। অ্যাতো অ্যাবসেন্ট। তোমার ঘরটা যেন কাকাইয়ের স্কুল। হি হি। তাই অ্যাবসেন্ট!

প্রবাসজীবনের মনে হলো সত্যিই বটে। অ্যাবসেন্টটা যেন বড় বেশী বেড়ে গেছে আজকাল। গলার সাড়াও পাওয়া যায় না যেন। শেষ কবে দেখা হয়েছে সৌম্যর সঙ্গে?

অন্তত বারো চোদ্দ দিন।

আজকাল রাত্রে খাওয়ার ব্যাপারটাও যে লীন হয়ে গেছে। রাত্রে খাদ্য হচ্ছে এককাপ হরলিকস আর দুখানা বিস্কুট।

মাঝখানে হঠাৎই একবার হৃদয়ের ওপর মৃদু একটু আক্রমণ ঘটায় ডাক্তারের এই নির্দেশ।

সকালে?

সকালে নাকি সহজে উঠতে পারে না সৌম্য। বেলা অবধি ঘুমিয়ে থাকে। তারপরই তাড়াহুড়ো।

কাটুম বলল, তো তুমিই কাকাইয়ের ঘরে যাও না কেন, যখন থাকে গেলেই দেখতে পাবে।

কখন থাকে তোর কাকাই তাই জানি না। মনে মনে বললেন,

আমারও তোর কাকাইয়ের ঘরে যেতে লজ্জা করে। কী জানি তোদের মা বাবা আবার কী ভেবে বসে। হয়তো ভাববে কনিষ্ঠ-পুত্রের সঙ্গে কিছু আঁতাত হচ্ছে।

মুখে বললেন, তোর কাকাই তো তিনতলায় শোয়। আমাকে তো সিঁড়ি উঠলে ডাক্তারবাবু মারবে।

মারবে। আর কিছু না। বুড়োধাড়ি লোককে মারবে। যত সব বাজে কথা। বুড়োরা কেবল বাজে কথা বলে।

কিন্তু প্রবাসজীবন এতদিন ধরে আর এতবার কারেকশান করে করে কাকে চিঠি লিখলেন ?

আর হঠাৎ তাঁর ছোট ছেলের সঙ্গেই বা এত কী দরকার পড়ল ? যে ছেলে একবাড়িতে বসবাস করেও দশবিশ দিনে বাবার সঙ্গে দেখাটা পর্যন্ত করে না।

বড় ছেলে তো তবু সর্বদাই আসে তার সদা উত্তেজিত মূর্তিটি নিয়ে। অভিযোগের আর ব্যঙ্গের স্বর ছাড়া তার কণ্ঠ থেকে আর কোনো রকম স্বর শুনতে পান না প্রবাসজীবন। কিন্তু তবু তো শুনতে পান। 'বাবা' বলে ডেকে ঘরে তো ঢুকে আসে। সে ডাক যতই উত্তপ্ত আর অধীর হোক।

প্রবাসজীবন মাঝে মাঝে ভাবেন, সৌম্য রাজনীতিটিতি করতে যায় না। যা মনে হয় একটা ভাল কাজের সঙ্গেই যুক্ত আছে সৌম্য। যদিও 'কী করিস ?' বললে সে উড়িয়ে দেয়। তবু মনে হয় জনসেবা আর্তসেবাগোছের কিছু একটা হবে।

কিন্তু 'আর্ত' মানে কী ?

আর্ত মানে কী শুধু দুঃস্থ গরীব ?

সুখের বিছানায় শুয়ে থাকা মানুষও কি কখনো 'আর্ত' হতে পারে না ?

'ভবেশ ভবনে' ঢোকবার মুখে দরজার সামনের তিনধাপ সিঁড়ির ওপর ধাপটায় বসেছিল ছেলেটা। রোগা হ্যাংলা, মাথায় রুক্ষ চুলের

বোঝা, পরনে একটা অনেকগুলো 'জানলা দরজা' সমেত হাতকাটা গেঞ্জি আর কোমরে একটা জরাজীর্ণ ইজের। একসময় হয়তো কোনো রং ছিল, এখন নেই। বয়েস বছর আষ্টেক।

ছেলেটার মাথার ওপর দিকে দরজার দুটো পাল্লায় মোটা কাগজের ওপর আঁটা দুটো কথা—'ভবেশ-ভবন'।

এও পাগলা সুকুমারের একটা খেয়াল।

দুটো ঘরওলা এই প্লাস্টার খসা রংজ্বলা বাড়িটার এখন জমকালো এই একটা নামকরণ করেছে সে। এবং খানিকটা কাগজ আর ময়দার আঠার সাহায্যে কাজটি সম্পন্ন করেছে।

আর সবাই হেসেছে। কিন্তু সুকুমার তাতে দমেনি। সে মনে মনে ঠিক করে রেখেছে, পাকাপোক্তভাবে একটা ফলক সে বসাবেই ভবিষ্যতে।

সৌম্য 'ভবনে' ঢুকতে এসেই ছেলেটাকে দেখতে পেল। বাড়িটায় রাতে এবং দিনেও বেশ খানিকটা সময় যে তালাটা ঝোলানো থাকে তার চাবিটা থাকে ওই চা-ওলার কাছে। যে কর্মীটি বা 'রা' সবশেষে চলে যায় সে তালা লাগিয়ে চাবিটা চা-ওলার জিম্মায় রেখে যায়। পরদিন যে প্রথম আসে সে চেয়ে নিয়ে এসে দরজা খোলে।

আজ সৌম্য এসেছে আগে।

ছেলেটা দরজা আটক করে বসে আছে।

সৌম্য বলল, কে?

ছেলেটা কথা বলল না। শুধু একটু একপাশ হয়ে সরে বসল যাতে প্রবেশ ইচ্ছুক ব্যক্তি সিঁড়িতে পা রাখতে পারে।

তবে সৌম্য সেই সংকীর্ণ ভূমিটুকুতে পা রাখল না।

আবার বলল, কী রে? কে?

ছেলেটা বেজার গলায় বলল, কে আবার? দেখতেই তো পাচ্ছো একটা মানুষের ছানা।

মানুষের ছানা।

হো হো করে হেসে ওঠে সৌম্য।

'মানুষের ছানা' কী রে? বেড়ালছানা কুকুরছানা শেয়ালছানা পাখির ছানা এই সবই তো জানি। মানুষেরও ছানা হয়?

বলা ঘাট হয়েছে আমার। দেখছো তো একটা মানুষ।

তো এখানে বসে আছিস যে?

ছেলেটা হঠাৎ ক্ষিপ্ত গলায় বলে উঠল, ক্যানো? বসতে মানা আছে? আইন নাই বসবার? বাড়ির বাইরেটা পাবলিকের জায়গা না?

ওরে সাবাস!

সৌম্য এই ক্ষুদ্র মাটির ভাঁড়ের মধ্যে আগুনের সঞ্চয় দেখে চমকে গেল। বলল, এইটুকু ছেলে এত বড় বড় কথা কেন রে? দেখতে পাচ্ছিস তো আমায় ভেতরে ঢুকতে হবে!

তো ঢোকো না। কে মানা করেচে?

একটু সরবি তো?

ছেলেটা আরো সরে কোণঠাসা হলো। কিন্তু উঠে পড়ল না। সেটাতে বোধহয় তার প্রেস্টিজের হান হবে।

সৌম্য অগত্যাই ওপরনিচে দুটো ধাপে পা রেখে তালাটা খুলে দরজা হাট করে ভেতরে ঢুকল। ছেলেটাও সঙ্গে সঙ্গে আবার মাঝখানে সরে এসে বসল।

তার মানে যে কেউ ঘরে ঢুকতে চাক বাধাপ্রাপ্ত হতে হবে।

ঘরের দরজা খুলে তো সেই জোড়া চৌকিটার ওপর উঠতে হয় চৌকির তলায় জুতোটা খুলে রেখে। সৌম্যও সেই ভাবেই উঠে বসল। ছেলেটা আড়চোখে দেখল। আর হঠাৎ একটু খিকখিক করে হেসে উঠল।

সৌম্য বলল, হাসলি যে?

কেন? হাসতেও মানা?

সর্বনাশ। এ যে একেবারে জাত কেউটে।

সৌম্য আর কিছু না বলে চৌকির ওপর এক টুকরো পাথর চাপা দিয়ে রাখা একগোছা কাগজকে পাথর চাপা থেকে উদ্ধার করে দেখতে লাগল।

এটা একটা আবেদন পত্রের খসড়া।

গৌতম গতকাল শেষ অবধি লিখে রেখে গেছে ।

আবেদনটা পৌরপিতার কাছে।

নিজেদের 'প্রতিষ্ঠানের' (তা একটা কিছু তো বলতেই হবে) আদর্শ ও উদ্দেশ্য সংক্ষিপ্তভাবে বুঝিয়ে বলা হয়েছে যথার্থই যদি সমাজ থেকে এরকম একটা অমানবিক ব্যবস্থা তুলবার চেষ্টা করতে হয়, তবে সরকার পুরপ্রতিষ্ঠান এবং অবশ্যই জনসাধারণকে একসঙ্গে ভাবতে হবে চেষ্টা করতে হবে।

কেবলমাত্র বস্তিউচ্ছেদ করে অথবা বেআইনি ঝুপড়ি ভেঙে দিয়ে দারিদ্র্য সীমার নিচে পড়ে থাকা মানুষদের চোখের সীমানার বাইরে ঠেলে দিলেই কি আত্মপ্রসাদে সন্তুষ্ট হতে হবে? ওই হতভাগ্যদের যথাযথ একটু আশ্রয় না দিতে পারলে তাদের মধ্যে কী করে চেতনা আনতে পারা যাবে? আর নিজেদের মধ্যে ভিতর থেকে চেতনা না এলে উপর থেকে চাপানো বক্তৃতা আর আইন পাশ-এ কোনো কাজ হবে না। অতএব—মাননীয় পৌরপিতা যদি—

গৌতমের ভাষাটা জোরালো তাই এ ভারটা সে নিজেই নিয়েছিল।

সৌম্য লেখাটা দেখছিল উল্টেপাল্টে ।

এই সময় খোলা দরজার সামনে ব্রততীকে দেখতে পেল। উঠে দেখবার প্রশ্ন নেই। দরজার সঙ্গে চৌকিটার ব্যবধান হাত দেড়েক। উঠল না। তাকালোও না বিশেষ, তবে কানটা নিজের কাজ করতে থাকল।

শুনতে পেল ব্রততী বলে উঠল, আরে চেনা চেনা মনে হচ্ছে। তুই আতাবাগান বস্তির নির্মলার ছেলে উদয় না?

হুঁ।

এখানে এভাবে বসে আছিস যে একা একা?

ছেলেটা গোঁয়ার গলায় বলল, বাবাঃ। এত বড় পিথিমাটায় কোতাও একটুক বসতেও জায়গা নাই। সব্বাই শুদোতে বসবে কেন কী বিত্তান্ত!

ব্রততী একবার চোখের পাশ দিয়ে সৌম্যকে দেখে নিলো। চোখে চোখে হয়তো একটু বাক্যবিনিময়ও হলো। বুঝল ইতিপূর্বে এই জিজ্ঞাসাবাদ হয়ে গেছে একবার। আর বুঝল ছেলেটা কোনো কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে বাড়ি থেকে চলে এসে বসে আছে। মৃদু হেসে বলল, তো তোকে দেখে মনে হচ্ছে খুব খিদে পেয়েছে।

দেকে মনে হচ্চে! মানুষকে দেকে বোঝা যায় এ কতা? গায়ে নেকা থাকে?

বলেই ছেলেটা হঠাৎ ছেঁড়া গেঞ্জির তলাটা টেনে চোখের কোণের কাছে তুলল।

ব্রততী বলল, ওমা তা আবার থাকে না? না থাকাল বুঝলাম কী করে? তো এখানে তো আর আমার রান্নাঘরটর নেই! ঝপ করে একবার ওই চায়ের দোকানে বলে দিয়ে আয় তিনটে চা আর চারটে লেড়ো বিস্কুট।

ছেলেটা ঝপ করে উঠে পড়ে হাত বাড়িয়ে বলল, পয়সা।

এখন দিতে হবে না। পরে নেয়। তুই বলে আয়।

ছেলেটা চলে যেতেই ব্রততী ঘরের মধ্যে ঢুকে এল। অর্থাৎ চটিটা নিচেয় রেখে চৌকির ওপর উঠে এল।

সৌম্য বলল, চারটে 'নেড়ো' কেন? আমাদেরকেও খেতে হবে না কী?

সে ভাবনা নেই। ও একাই খাবে। বেচারা!

ওকে চেনো?

ওই তো আতাবাগান বস্তিতে গেছি কতবার। ওর মা নির্মলাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছি ছেলেকে স্কুলে দিতে। একটা বছর দশেকের দিদিও আছে এর, শুনলে বিশ্বাস করবে, তিন বাড়ি বাসন মাজে কাপড় কাচে। মা বলেছিল, না খাটলে ভাত জুটবে কোথা থেকে? হতচ্ছাড়া বাপটা গতর নাড়ে?

উদয় চলে এল।

ব্রততী বলল, আয় ভেতরে আয়।

ভেতরে তো তোমাদের চৌকিপাতা। ঢোকার ফাঁক ফোকর রেকেচ ?

চৌকিতেই উঠে আয়।

কেন? এখেনেই তো বেশ আচি।

আহা, চা এলে খাবি তো।

এখেনে বোসে খাবো।

তা 'এখেনে' আসতেই বা কী ?

বড় মানুষদের সঙ্গে এক চৌকিতে বসব ? অতয় কাজ নাই। বলল, এক্ষুণি আনচে।

সৌম্য ইংরিজিতে বলল, বালকটি দেখছি অগ্নিগর্ভ।

তাই দেখছি। মা-টিও অনেকটা তাই।

চা এল, এরা দুজনে দুটো ভাঁড় নিল। ছেলেটাকে একটা চা আর বিস্কুট চারটে দিতে বলল।

চা-আনা ছেলেটা একবার সন্দেহ আর অবজ্ঞার দৃষ্টিতে উদয়ের দিকে তাকিয়ে ওর সামনে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল।

তা দিতে যা দেরি।

মনে হলো, কাকে-চিলে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গেল বুঝি, এমন মুহূর্তে তার পেটের মধ্যে জিনিসগুলো চালান করে দিল।

ব্রততী বলল, মনে হচ্ছে আরো খিদে আছে। এই নে, পরে মুড়ি কিনে খাস।

একটা টাকা বাড়িয়ে দিল ব্রততী।

কিন্তু টাকাটা সেভাবে ছোঁ মেরে তুলে না নিয়ে ওই বছর আষ্টেকের ছেলেটা একটু দার্শনিক হাসি হেসে বলল, দান ভিক্ষে দিয়ে কি আর খিদা মিটাতে পারবে আমার ?

চমৎকৃত দুটি বিদ্বান বিদুষী পরস্পরের দিকে দৃষ্টি বিনিময় করল।

ছেলেটা ইত্যবসরে বলল, তোমার কাচে একটা কতা ছেল।

ওমা, তাই বুঝি ? তা এখানে যে আমায় পাবি কী করে জানলি ?

জানি।

তুই তো থাকিস আতাবাগানে।

কতোদিন আগে বাপটা একদিন বলেছেল, যা তো দিদিমণিটাকে 'ফলো' কর তো। দেকে আয়, কোতায় যায়। কোতায় থাকে।

ব্রততী একটু গম্ভীর হলো। বলল, ভাল।

রাগ করলে? হেই দিদি, আমার দোষ লাই। বাপটা বলেছেল, তাই। তো এখন—

সৌম্য বিরক্ত গলায় বলল, তা 'বাপটা বাপটা' করছিস কেন? শুধু বাবা বলতে পারিস না?

অমন বাবার মুকে ছাই।

সৌম্য নিচু গলায় বলল, ব্রততী, তোমার পুষ্যি-পুত্তুরটিকে বলে দাও এভাবে অসভ্যের মতো কথা না বলতে।

ব্রততী একটু হাসল।

বলল, সেটা কীরকম হবে জানো? রাস্তার ওই ছাগলটাকে বলা, 'তুই পেন্টুল না পরে রাস্তায় বেরোবি না।'

হেসে উঠল দুজনেই।

ছেলেটা ইতিমধ্যে ঢুকে এসে চৌকির ওপর একটা হাত রেখে বলল, বলতেচি কি, তোমাদের এই ঘরখানায় তো রাতে কেউ শোয় না।

কে বললে তোকে এত কথা?

জানি। জানি শোয় না কেউ। তালাবন্দো থাকে, তো রাতটুকুন আমারে থাকতে দ্যাও না।

তোকে থাকতে দেব?

দিলেই বা।

উদয় তেজের সঙ্গে বলে, তোমাদের এখেনে তো একটা ফুটো কলসীও নাই যে চুরি যাবার ভয়। পড়ে থাকে। একটা মনিষ্যির উপগার হয় এটু খুলে রাখলে।

সৌম্য আবার বিজাতীয় ভাষায় বলল, কী জোরালো ভাষা। এর বয়েস কত হবে মনে হয়?

বছর আষ্টেক বড় জোর।

ওকে কোনো পার্টির দাদা ধরিয়ে দিলে এক্ষুণি ময়দানে গিয়ে লেকচার দিতে পারে সে।

হুঁ।

ব্রততী ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বলল, তো এখানে থাকতে আসবি কেন? তোর তো ঘর আছে। মা বাপ আছে।

উদয় আবার গোঁয়ারের গলায় বলে উঠল, উদোয়ের কিছু নাই, কেউ নাই।

ওঃ। মা খুব বকেছে বুঝি? না পিটনচণ্ডী।

উদয় গম্ভীর ভাবে বলে, তোমাদের কাচে সবই তামাসার বিষয়। মা কেষ্ট কাকার সঙ্গে ভেগে গেছে, বাবা আমায় চ্যালাকাট পিটিয়ে দূর করে দেচে।

দুঃখ নয়, অশ্রুপাত নয়। যেন আগুনের হলকা ছিটিয়ে দিল ছেলেটা।

ব্রততী আস্তে বলল, মা কেষ্ট কাকার সঙ্গে ভেঁগে গেছে মানে?

এর আবার মানে কী? কতকাল আর মোদো মাতালের ঠাঙানি খেয়ে খেয়ে পড়ে থাকবে? অ্যাঁ? রক্তোমাংসের শরীর তো বটে।

এবার হঠাৎ গলার স্বরটা আর্দ্র হয়ে এল।

তাও তো ছেলো। ছেলেটা মেয়েটার মুক চেয়ে ছেলো। তো বাপ মাকে লুকিয়ে দিদিকে সেই মোটা লোকটার কাচে বেচে দিয়েচে জেনে মা বাপটাকে খামচিয়ে কামড়িয়ে নাথি মেরে হাঁড়ি কলসী ভেঙে দে চলে গেল। তো যাকগে এ কতা। থাকতে দেবে তো বল।

ব্রততী একবার সৌম্যর দিকে তাকাল।

ব্রততী তারপর বলল, দেব।

দেবে? ঠিক বলচো?

বলচি। তা ততক্ষণ তাহলে একটু মুড়ি জিলিপি খেয়ে আয়।

একটা দুটাকার নোট এগিয়ে দিল এখন।

উদয় এখন নিল হৃষ্টচিত্তে। বলল, কতার ঠিক থাকে যেন।

ব্রততী বলল, থাকবে। তোর বাবা যে দিদিকে বেচে দিল, এতে পুলিশে ধরে তা জানিস? জেল হয়।

জানি না অতোসতো। মোটা লোকটা তো তাড়িওলা, ওর কাচে বাপটা কেবোল ধার করে করে তাড়ি খেয়েচে এখন সে শোদ চাইচে। তো দেবে কোথ্ থেকে? তাই তার বদলে দিদিটাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ওর কাচে বেচে দেল। আমি যাই!

চলে গেল।

সৌম্য!

ব্রততী আস্তে বলল, মহাসমুদ্রের কোন ঘাট থেকে নেমে জল মাপতে চেষ্টা হবে?

সৌম্য একটু হাসল।

সমুদ্রের তো ঘাট থাকে না ব্রততী।

আমরা এদের মধ্যে চেতনা আনবার জন্যে চেষ্টা করে চলেছি?

চলতেই হবে। কিন্তু তুমি যে ওকে আশ্বাস দিলে রাত্তিরে এই ঘরে থাকতে দেবে। তার কী হবে?

দিলে ক্ষতি কী সৌম্য? ভবেশদার ঘরটা বাদেও ওদিকে একটা রান্নাঘর মতো আছে। একটা প্যাসেজ আছে। একটু মাটির উঠোনও আছে দেখেছি। থাকলেই থাকতে পারে।

তুমি তো বেশ সরল অঙ্ক কষে গেলে। আর সব মেম্বাররা রাজী হবে?

রাজী না হবার কী আছে? ছেলেটা তো ঠিকই বলেছে, চুরি যাবার মতো তো এখানে কিছু নেই। বাদে ভবেশদার কিছু বই পত্তর। তো সেও চোরের লোভনীয় নয়।

সুকুমারকে বলে দেখো।

ব্রততী দৃঢ় স্বরে বলল, শুধু সুকুমারকে কেন? সুকুমারই তো একমাত্র অছি নয়। সবাইকেই বলব। আমি তো কোনো ক্ষতি দেখছি না। বরং ঘরদুটো একটু ঝাড়পোঁছ করতে পারে।

সৌম্য একটু হাসল।

বলল, সেটা কিন্তু আমাদের নীতিবিরুদ্ধ। যাক, থাকলই না হয়, খাবে কী!

সেটা ভেবে ঠিক করতে হবে। পুলিশে খবর দিয়ে ওর 'বাপটকে' ভয় পাইয়ে সে ব্যবস্থা করা যায়।

করা অবশ্য যায় না ব্রততী। শুধু স্বপ্ন দেখাই যায়। তো সে যাক, একা একটা বাড়ির মধ্যে অতটুকু ছেলে একা থাকতে পারবে?

ব্রততী এখন বলল, সেটা একটা কথা বটে। আসুক জিগ্যেস করে দেখা যাক।

ছেলেটা আসার আগেই গৌতম এসে গেল। বলল, পড়েছো লেখাটা?

পড়লাম!

ভবেশ ভৌমিকের নীতিতে এখানে কারো সঙ্গে কারো 'আপনি আজ্ঞে' চলে না। সবাই 'তুমি'। আর যদি ভবেশের মতো 'তুই'তে নামতে পারো তো উত্তম।

সেটা কেউ পারুক না পারুক, 'তুমি'টা চালু।

সৌম্য বলল, ইতিমধ্যে একটি অন্য ধরনের সমস্যা দেখা যাচ্ছে।

ব্রততী বলে উঠল, অন্য ধরনের বলা যায় কী করে সৌম্য? বলতে পার একই সমস্যা—বৃক্ষের আর একটি শাখা।

অতঃপর সংক্ষেপে উদয়ের ঘটনাটা এবং তার প্রার্থনাটি জানিয়ে দিল গৌতমকে।

গৌতম বলল, আমরা একা কেউই কোনো ডিসিশান নিতে পারি না। সবাই আসুক।

তাহলে একদিন সবাইকে একসঙ্গে আসার জন্যে নোটিশ দিতে হয়। জমায়েত হলে—

ব্রততী একটু হেসে বলল, এটা নেহাৎ মশা মারতে কামান দাগার মতো হবে না গৌতম? আমি তো কোনো আপত্তির কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। একমাত্র ছেলেটার একা থাকার প্রশ্ন ছাড়া।

গৌতম ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে বলল, মাত্র ওইটুকু? এই রাতে থাকতে দেওয়া নিয়ে কোনো বিপদ আসতে পারে কি না তুমি জানো?

ব্রততী হাসল।

বলল, গৌতম ও একটা 'নাবালিকা তরুণী' নয়, একটা নেহাৎই বালক মাত্র।

তাতে কী? এটা যে একটা ফাঁদ পাতা নয়, তাই বা জানতে যাচ্ছে কে?

ফাঁদ পাতা?

হ্যাঁ। ধর দু'রাত থাকল। হঠাৎ যদি ওর বাবা পুলিশ নিয়ে এসে বলে আমার ছেলেকে এরা আটকে রেখেছে। কী বল অত্রি?

আমি আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি গৌতম ও একটা মেয়ে নয়। ছেলে। পুলিশকে জবাব ও নিজেই দেবে।

অত্রি বলে উঠল, তা সত্যি! হয়তো ওই ছেলেই ভোল বদলে উল্টো কথা বলবে। পৃথিবী বড় ভয়ানক জায়গা ব্রততী।

ব্রততী আস্তে বলল, তবুও তো আমরা এই পৃথিবীতেই কাজ করতে চাইছি অত্রি! এদের বুদ্ধি ফেরাতে চাইছি। ঠিক আছে, তেমনটা হলে সমস্ত দায়িত্ব যদি আমি নিই?

তুমি? মানে?

মানে পুলিশকে যা বলবার সেটা যদি আমিই ভার নিই?

অকারণ বাহাদুরি নেওয়ার কোনো মানে হয় না। তুমি কী বল সৌম্য?

সৌম্য হেসে বলল, আমি কী বলব? ব্রততীও তো নাবালিকা নয়। একটা অ্যাডাল্ট! যা বুঝবে করবে!

গৌতম জেদের গলায় বলল, তাহলেও সকলের মত না নিয়ে—

এতক্ষণে সুকুমার এলো।

আসা মাত্রই চৌকিতে উঠে ওধারে এগিয়ে গিয়ে ধূপ জ্বালাল। বলে উঠল, ভবেশদা দেরি হয়ে গেল। রাস্তা জ্যাম ছিল।

গৌতম বলল, আচ্ছা ঠিক আছে। এখন একটা প্রবলেম হয়েছে—

সুকুমার মন দিয়ে শুনল।

তারপর বলল, ব্রততী ঠিকই বলেছে। এতে এত চিন্তার কী আছে? ভবেশদাকে জিগ্যেস করে নিলেই তো হয়।

কেউ কেউ অস্ফুটে, কেউ বা মনে মনে বলল, 'ন্যাকা'।

সুকুমার ওধারে সরে গিয়ে দেওয়ালে টাঙানো পায়জামা পাঞ্জাবির সামনে গিয়ে বলল, ভবেশদা, নির্দেশটা দিয়ে দিন।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, ভবেশদা তো কোনো আপত্তি করলেন না। বললেন, রাখ না। ক্ষতি কী?

গৌতম ব্যঙ্গের গলায় বলল, দুঃখের বিষয় দৈববাণীটি একমাত্র তুমি ছাড়া আর কারো কর্ণগোচর হয়নি।

সুকুমার ফিরে দাঁড়াল। বসল।

বলল, এটা তো কর্ণগোচরের জিনিস নয় গৌতম। মর্মগোচরের চেষ্টা করলে সবাই শুনতে পেতে পারো।

এ সময় উদয় ফিরে এল।

তার পিছনে চা-ওলা সেই ছেলেটা।

মজা দেখতে এসেছে হয়তো।

উদয় এই সমবেতদের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে ব্রততীর সঙ্গে মুখোমুখিভাবে বলল, তো আমার ব্যবোস্থাটা তাহলে পাকা হলো তো?

ব্রততী বলল, তা না হয় হলো। কিন্তু তুই ছেলেমানুষ। একটা বাড়িতে একা থাকতে পারবি?

ফুঃ। পারবো না আবার ক্যানে? ভারী সাত মহোলা বাড়ি। তবে থাকতে হবে না একা। এই তপনদা বলেছে রাতটুকু থাকবে আমার সঙ্গে। কথা পাকা।

তপনদা।

ওর নাম তপন নাকি। এতকালের মধ্যে কেউ জানে না।

শচীন বলে উঠল, ইতিমধ্যেই ওর সঙ্গে পাকা কথা হয়ে গেল? আর আমরা যদি থাকতে দিতে রাজী না হই?

ওঃ। যদি রাজী না হও।

আবার ফস করে আগুন জ্বলে ওঠে।

না দিলে না দেবে। গরীবের ফুটপাতটা তো কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। চল তপনদা।

ওরে ব্বাস।

সৌম্য বলে ওঠে, এতটুকু ছেলে। তোর মধ্যে এতো আগুন কেন রে? ও দাদাবাবু তো ঠাট্টা করে কথার কথা বলেছে।

ঠাট্টা! তাই বল। কেমন করে বুঝব বল? আমরা কি আর তোমাদের ঠাট্টার যুগ্যি। তপনদা। তাহলে ওই কথাই রইল।

তপন মাথাটা একবার ঝাঁকিয়ে চলে গেল। তার পিছু পিছু উদয়ও একটু এগিয়ে গেল।

শচীন বলে উঠল, ওর যা ইতিহাস শুনলাম তাতে তো এমন মনে হচ্ছে না শুধু শুতে দিলেই চলবে। খাবে কী? সেটার জন্যে তো আর কোথাও বেওয়ারিশ পড়ে থাকা কোনো খাদ্যভাণ্ডার পড়ে নেই?

এ কথাটা অবশ্য এতক্ষণ ওঠেনি।

সকলেই একটু চুপ।

শচীন স্বকুমারের দিকে একটু ব্যঙ্গের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, কী স্বকুমার? কোনো নির্দেশ পাচ্ছো?

স্বকুমার অবিচলিত গলায় বলল, ওর আবার অত উঁচু থেকে নির্দেশ পাবার কী আছে? যার যার নিজের মনের মধ্যে থেকেই সে নির্দেশ পাওয়া যায়। আমরা এতগুলো লোক একটা ছোট ছেলের খাওয়ার ভার নিতে পার না? সকলে সামান্য কিছু কিছু দিলেই তো—

তোমার অঙ্কটাও যে দেখছি ব্রততীর মতই সরল। ব্যাপারটা বরাবরের।

বরাবরের মানে কী? বড় হলে তো ও নিজেই কোনো ভাবে—

আমরা এতগুলো লোক একটা বাচ্চার ভার নিতে ভাবনায় পড়ছি। তবে আর ওদের গরীব হতভাগ্য মা বাপের কী দোষ? তারা কি আর নিজের দায়িত্ব ভাবে? তাদের মতে জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি।

এর মাঝখানে কখন উদয় নামের ছেলেটা উদয় হয়েছিল কে জানে।

হঠাৎ তার সেই তীক্ষ্ণ জেদি গলাটা শুনতে পেল সবাই।

উদয় হতোভাগা 'কী খাবে' তা নিয়ে চিন্তা করার দরকার নাই। নিজের খোরাকি নিজেই জুটোতে পারবে। খেটে খাবে।

খেটে খাবে।

সৌম্য বলে উঠল, আমাদের এই দলের নিয়মটা কী জানিস?

জানি।

কী জানিস?

বাচ্চা মনিষ্যিরা না খাটবে। নেকাপড়া শিকবে। মানুষ হবে। গরীবের ঘোড়া রোগ।

ও সাবাস। এতো জানিস? তবে বলছিস কেন খেটে খাব?

আপনারা বললেই তো আর হলো না। মিছিমিছি 'খোয়াব' দেকে কোনো লাব আচে? ক্ষ্যামোতা থাকতে চাঁদার ভাত খেতেই বা যাব কেন? খেটেই খাব। তো থাকতে দেবে কিনা সেটাই পষ্টো করে বলো। চুকে যাক!

ব্রততী এখন বিরক্ত গলায় বলে, বলেছি তো দেব। আবার অমন অভব্যর মতো কথা বলছিস কেন?

হঠাৎ কী হয়। উদয় নামের এই বীরবালক—উথলে কেঁদে উঠে বলে, সব্যো ভব্যো কতা কবে শিকেচে উদয়? গেয়ান থেকে তো কেবলই মা বাপের চুলোচুলি আর বস্তির অন্যজনাদের হল্লা কোঁদল মুখখিস্তি শুনে শুনে—

গেঞ্জিটা তুলে চোখ মুছতে থাকে উদয়।

* * *

'ওল্ড হোম ?'

সৌম্য প্রবাসজীবনের এগিয়ে দেওয়া কাগজখানায় একবার চোখ বুলিয়ে কাগজটা ভাঁজ করে হাতে রেখে বলে ওঠে, কী লিখেছ এসব যা তা? মাথাফাতা খারাপ হয়ে গেল নাকি তোমার? এই জন্যে ডেকেছ আমায়? তোমার জন্যে একটা ওল্ড হোমের ব্যবস্থা করতে হবে?

প্রবাসজীবন বললেন, তুইও আবার দাদার মতো মাথা গরম করছিস কেন বাবা? যা বলবি কাছে এসে এসে বল (অর্থাৎ আস্তে বল)।

সৌম্য বলল, বলাবলির আর কী আছে? এখন দেখছি অন্য ডাক্তার দেখাতে হবে তোমাকে। আশ্চর্য! এই অদ্ভুত কথাটা হঠাৎ মাথায় এল কোথা থেকে বলো তো?

প্রবাসজীবনের ইচ্ছে হলো বলে ওঠেন, হঠাৎ নয় রে বাবা, ধীরে ধীরে তিলে তিলে এই ইচ্ছেটা মাথায় এসেছে। নাঃ, মাথায় নয়, মনে প্রাণে হৃদয়ে। তুই কী জানবি একদার একটা কর্তা প্রভু, সর্বেশ্বর মানুষের পক্ষে এমন অসহায় পরনির্ভর আর সদা সন্ত্রস্ত হয়ে থাকার কী যন্ত্রণা!

এই প্রবাসজীবনের কোনো ইচ্ছের ছন্দাংশটুকুও প্রকাশ হয়ে পড়লেই তৎক্ষণাৎ সমারোহের সঙ্গে সে কাজ হয়ে যেত।

সরোজরা আর অনেকদিন আসে না।

আর আসবেই বা কী, যা দূরে চলে গেছে। কে জানে কেমন আছে সব।

ব্যাস? ওইটুকুই।

পরের রবিবারেই দেখা গেল সল্টলেকের সরোজরা সপরিবারে নিমন্ত্রিত হয়ে এসে কেয়াতলা লেনে সারাটা দিন কাটিয়ে গেল।

সরোজ কে?

এমন কেউ না। প্রবাসজীবনেয় দূরসম্পর্কের পিসতুতো ভাই। এক পাড়ায় থাকা আর এক স্কুলে পড়ার সূত্রে 'দূর'টা 'নিকট' হয়ে গিয়েছিল।

এই ছ্যাখো কাণ্ড! অ প্রণতি, পোস্টকার্ডটা ছ্যাখো। কাল সক্কালেই ঘোতনদা আসছেন বারাসত থেকে, এখান থেকে মেয়ে দেখাবেন। এই নাও, দেখো।

দেখেছি। তোমার আগেই। এর আবার কাণ্ডর কী আছে? নিজের তো মেয়ে নেই, বেশ একটা 'মেয়ে দেখাদেখি' হবে।

তোমার ঘাড়ে তো অনেক ঝঞ্ঝাট চাপল।

তাতে কী? হি হি হি। আমি তো দিব্যি একটা শক্ত ঘাড়ে চেপে বসে আছি। তুমি কাল একটু ভোরে ভোরে বাজারে গিয়ে মাছটা একটু নিজে দেখে শুনে এনে দিও দিকি। আর কিছু নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। মুখটা এমন কাঁচুমাচু করছ যেন কতই বিপদে পড়েছ। হি হি হি এদিকে প্রাণটি তো আহলাদে আটখানা হচ্ছে। মাছ, মাংস যা আনতে বলব তার ডবল এনে বসবে, আর বোকা সাজবে। হি হি খিলখিল। বাবাঃ, তোমার প্রাণের ঘোতনদা। ছেলেবেলার হীরো।

ঘোতনদা কে?

মামাতো দাদা। নিজেরই অবশ্য।

প্রবাসজীবন তাঁর 'প্রাণের জনেদের' জন্যে যতটি আদর-যত্নের আকাঙ্ক্ষা করতেন, প্রণতি তার ডবল করতো।

প্রবাসজীবন বলতেন, তোমার আবার বড্ড বাড়াবাড়ি। এত করার কী দরকার ছিল?

আহা, ঢং! ওদের সঙ্গে খেতে বসে তো মুখে একশো পাওয়ারের আলো জ্বলে উঠল হে মশাই! তো ওরা কী রোজ আসবে?

ওগো, শুনছো। তোমাদের দেশের বাড়ি থেকে ওবাড়ির সেজ-খুড়ি আসছেন বারুণীতে গঙ্গা নাইতে। দুটো দিন থাকবেন হয়তো। অন্ততঃ বলতেও তো হবে। ভাল গোবিন্দভোগ চাল একটু আনিয়ে দিও। আর কাল অফিস ফেরৎ ওপাড়া থেকে ভাল ফলটল কিছু। শশীটা যদি কিছু চেনে।

হ্যাঁ, তখন শশী। তখনো ভূষণ আসেনি। দেবু তো নয়ই।

শুদ্ধাচারিণী জ্ঞাতি খুড়-শাশুড়ীর ব্যবস্থা নিয়ে কী যত্ন চেষ্টা। দেখানেপনা? আদৌ না, আন্তরিকই।

একটা ভাষা খুব জানা ছিল। ওঁরা কী তোমার বাড়িতে রোজ আসতে যাচ্ছেন? লোকই লক্ষ্মী, বুঝলে?

প্রণতির নিজের বাপের বাড়ির দিকে তেমন কেউ ছিল না। সবই প্রবাসজীবনের দিকের।

দেখো। সেজখুড়িমাকে এমনি তো কখনো কিছু দেওয়াটেওয়া হয় না। বাড়িতে এলেন। যাবার সময় একজোড়া থান ধুতি সঙ্গে দিলে ভাল দেখায়।

এতে কী প্রবাসজীবনের সংসারে টানাটানি হতো?

এই জীবনটি ছিল প্রবাসজীবনের।

আর এখন?

লাবুর ছেলেটাকে নিচের তলায় খালি পড়ে থাকা একটা ঘরে একটু জায়গা দিতে পারলেন না প্রবাসজীবন। মেয়েরাই কী শুধু বিধবা হলে অসহায় হয়ে যায়?

কত ছোট ছোট ব্যাপার প্রতিনিয়ত অলক্ষ্যে একটা গহ্বর খুঁড়ে চলেছে।

এখন আর বাড়িতে আমের সময় আম অথবা লিচুর সময় লিচু এলে কেউ ভাবতেও পারে না কাজের লোকেদেরও দিতে হয়। সকলের সঙ্গে সমান করে না হোক, কিছুও।

সাহস করে বলতে পারেন না 'ওদের দেওয়া হয়েছিল?'

বললেই হয়তো সমস্তগুলোই প্রবাসজীবনের কাছে এনে ধরে দিয়ে বলা হবে আপনিই বরং যতটা প্রাণ চায় দিয়ে দেবেন।

কখনোসখনো নিজের প্লেট থেকে তাও চুপি চুপি—আমটা কী মিষ্টিটা দেবুর হাতে দিয়ে বলেন, আজ তেমন খিদে নেই রে দেবু, তুই খেয়ে নে। এত পারব না, উঠিয়ে নিয়ে যাও, বলাবলি এক হাঙ্গামা।

'হৃদয়কে তালাচাবি দিয়ে বন্ধ করে রেখে দাও হে।'

কিন্তু এই সব ছোট ছোট কারণ কী সৌম্যর কাছে বলা যায়? বলা যায়, সৌম্য, সব থেকে যন্ত্রণা হচ্ছে পরাধীনতা। নিরুপায়তা। ভগবান আমায় মেরেছে খপ করে একখানা হার্টের রুগী বানিয়ে ফেলে।

তা যেটা বলা যায়, এবং যেটা সত্যিই সবথেকে কষ্টকর হয়ে উঠেছে, সেটা হচ্ছে নিঃসঙ্গতা।

কারো সঙ্গে মন খুলে তো দূরের কথা, এমনিও একটা কথা বলবারও কেউ নেই।

না হয় নাই থাকল বলার মতো কোনো কথা, কথার মতো কোনো কথা, তবু বাকশক্তি থাকা সত্ত্বেও কথা বলতে না পারা কি কম কষ্ট?

'দেশের হালচাল, কী বদলেই যাচ্ছে' এটুকুও তো বলতে ইচ্ছে করে, অথবা কাগজে কোনো একটা কিছু পড়লে, অবাক হলে, একটু আলোচনা করতে ইচ্ছে করে না সে নিয়ে?

তো আগে আগে চেষ্টা করেছেন।

আজকের কাগজ দেখেছিস দিব্য?

দিব্য অগ্রাহ্যের গলায় বলে, আপনার মতো অত কাগজ পড়া বাতিক নেই আমার! অফিসে গিয়ে একবার উল্টেপাল্টে দেখে নিই। সকালে সময় কোথা?

কাগজটা পড়তে সময় হয় না? কী বাবা তোরা?- আমি যেন আর অফিস যাইনি কখনো। ···চৈতালী দেখেছ?

কী আর দেখব? রাজ্যে কটা বৌ খুন হলো আর কটা বৌ আত্মহত্যা করলে, এই সবের হিসেব তো? ও আপনিই পড়ুন।

কিন্তু প্রবাসজীবনের সেই পিসতুতো মাসতুতো মামাতো খুড়তুতোরা? তারা কোথায় গেল? কেউ একবারও আসে না কেন?

তা কেনই বা আসবে? তারা কি সংসারের হাওয়া বদলের আঁচ পায় না?

যেখানে এসে দেখতে পায় গৃহকর্তাই ফালতু মাল, সেখানে তাঁর সম্পর্ক ধরে কে আবার আসতে চায় ?

কিন্তু এসবের কিছুই বলা যাবে না।

প্রবাসজীবন তাই ছোট ছেলেকে বললেন, মাথা খারাপের কী আছে ! ব্যবস্থাটা যখন আমাদের সমাজে চালু হয়ে গেছে, বাড়বৃদ্ধি হচ্ছে, তখন নিশ্চয়ই তার মধ্যে একটা ভাল দিক আছে।

সৌম্য গম্ভীরভাবে বলল, ভাল দিকটা কী ?

এই ধর, আমাদের মতো বুড়ো হাবড়ারা—একটা আড্ডাফাড্ডা পায়। সবাই নিষ্কর্মা বেকার, অবস্থায় মিশ খায়।

শুধু কতকগুলো বুড়োদের সঙ্গ পাবে বলে তুমি নিজের বাড়ি ছেড়ে 'ওল্ড হোমে' গিয়ে থাকতে চাইছ !

সৌম্যর চোখে তীক্ষ্ণসন্ধানী দৃষ্টি।

আরে বাবা সেটাই কি কম হলো ? সর্বদা একটা লোনলি ফীল করা—

দেখো বাবা, এটা তো কিছুটা মেনে নিতেই হবে। তো বুড়োদের সঙ্গ পেতে সন্ধ্যেবেলা পার্কে গিয়ে বসে থাকারও তো একটা ব্যাপার চালু আছে।

প্রবাসজীবন বলেন, 'আছে' নয়, ছিল। এখন আর নেই। বসবার মতো পার্কগুলো সব সমাজবিরোধীদের কবলে চলে গেছে। লোহার বেঞ্চটেঞ্চগুলো উপড়ে নিয়ে 'ভাঙ্গা লোহা'-দের বেচে দিয়েছে। নিজেরা ঘাসে বসে মদ খায়।

ঠিক আছে। তুমি রামকৃষ্ণ কালচার ইনস্টিটিউটে নিয়মিত যাওয়া শুরু কর তো। এখান থেকে বেশী দূর তো নয়। সেখানে অবশ্যই কিছু বুড়ো পাবে। সৎ, সভ্য, ভদ্র, সুন্দর একটা পরিবেশ। ভাল ভাল কথার আলোচনা হয়। মনে শান্তি পাবে।

প্রবাসজীবন হঠাৎ বলে ফেলেন, সে আর কতটুকুর জন্যে ? তারপর তো আবার ফিরে আসতে হবে। সেই পরাধীনতা, সেই নিঃসঙ্গতা—

সৌম্য বাপের মুখের দিকে স্থির চোখে একটু তাকিয়ে বলল, বাবা।

প্রবাসজীবন তাকালেন।

আসল কথাটা আমায় খুলে বল তো?

প্রবাসজীবন একটু কেঁপে উঠলেন।

বাঃ! আসল কথা আবার কী? ওই তো বললাম।

বাবা! এই তিনতলা বাড়িখানা তোমার নিজের তৈরি! এই সংসারটা মার নিজের হাতে গড়া।

'মার নিজের হাতে গড়া!'

শুনেই হঠাৎ প্রবাজীবনের ভিতর থেকে যেন একটা প্রবল বাষ্পোচ্ছ্বাস উথলে উঠে বাইরে এসে আছড়ে পড়তে চাইল।

শুধুই গড়া?

তিল তিল করে গড়া নয়? প্রতিনিয়ত সেই গড়ার স্বপ্ন দেখে চলা নয়?

কোথাও বেরোলেই চারিপাশের দোকানগুলোর দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টি হেনে আটকে যাওয়া।

ওগো, দেখো দেখো, কী সুন্দর ছোট ছোট বেতের র‍্যাক সাজিয়ে রেখেছে। একটু দেখো না গো। কত দাম জিগ্যেস করো না!

আশ্চর্য! যা দেখবে তাতেই মোহিত। ও নিয়ে কী হবে?

কী আবার হবে? কাজে লাগবে। দালানের ধারে দুটো জানলার মাঝখানের জায়গাটায় বসিয়ে রাখব। খবরের কাগজ মাসিক পত্র-টত্রগুলো থাকবে। কেমন ছিমছাম দেখতে লাগবে।

কদ্দিন ছিমছাম থাকবে শুনি?

আহা, বেশী জমে গেলে সরিয়ে ফেলব না বুঝি? জিনিস কিনতে চাইলেই তোমার কেবল বাধা দেওয়ার তাল।

তুমি যে মহারানী, জিনিস দেখলেই তালকানা। নিজেই গাড়ি থেকে নেমে জিজ্ঞেস করো। তারপর ওঠাও।

গাড়ি মানে অবশ্য ট্যাক্সীই। নিজের গাড়ি করে উঠতে

পারেননি প্রবাসজীবন। কিন্তু সে নিয়ে মাথা ব্যথা ছিল না প্রণতির।

দেখো, কাঁসার বাসনগুলো এখনকার বাসনমাজুনিরা এত বিচ্ছিরি করে মাজে। ভাবছি মাসে মাসে কিছু কিছু করে কিনে, সব স্টেনলেশ স্টীল করে ফেলব। ছোটখাটো কতকগুলো তো কেনাই হয়েছে বাসনগুলির কাছে।

আচ্ছা, বিনয়মামাদের বাড়িতে একটা জিনিস দেখলে?

'একটা' কেন, একশোটাই তো দেখেছি।

আহা, সবগুলোর কথা বলছি যেন আমি, বলছি সিঁড়ির দেওয়ালে কী সুন্দর সিঙ্গল সিঙ্গল ব্র্যাকেট আলনা লাগানো। ছাতা ঝুলিয়ে রাখো, লাঠি ঝুলিয়ে রাখো, ওয়াটার প্রুফ ঝুলিয়ে রাখো, দিব্যি মানিয়ে যাবে, বাড়ির মধ্যেটা জবড়জং হবে না।

কত মনে করবেন প্রবাসজীবন?

কিন্তু সে সব তো আর এখন বলতে বসার নয়। বললেন, সে আর নতুন কথা কী? সবই তো—

হঠাৎ পরাধীনতার প্রশ্ন এল কেন?

প্রবাসজীবন একটু বিহ্বল দৃষ্টিতে তাঁর ছোট ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন, তুইই বল তো কেন? কেন আমাকে সব সময় বোকা বনে বসে থাকতে হয়?

সৌম্য যে এসবের কিছুই অনুমান করতে পারে না তা নয়। সামান্য সময়ের জন্যে বাড়িতে থাকলেও, ছোটখাটো কিছু কিছু চোখে পড়ে। যেটা হাঁড়ির একট ভাত টিপে দেখার মতো।

সৌম্য বাবার কাছ থেকে উঠে একবার ঘরের মধ্যে পায়চারি করে নিল। টেবিলের শিশি কৌটো এটা ওটা একটু তুলে তুলে দেখল। সামনের জানলার পর্দাটা একটু সরিয়ে দিল।

তারপর হঠাৎই ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, আচ্ছা বাবা, সেই যে কবে যেন লাবুপিসির ছেলের এখানে এসে থেকে অফিস করার কথা হয়েছিল। সেটা ক্যানসেল হয়ে গিয়েছিল কেন?

প্রবাসজীবন আবার কেঁপে উঠলেন।

তিনি কি মনের দুঃখ বেদনা প্রকাশ করতে বসে ছোটছেলের কাছে বড়ছেলের নামে অভিযোগ করে বসবেন?

নাঃ! এত ছোটো হওয়া মানায় না।

অন্যমনস্কের মতো বললেন, সেই যে বলেছিলাম, মাকে একা দেশের বাড়িতে ফেলে রেখে এসে থাকতে চাইল না। ডেলি প্যাসেঞ্জারিই করবে বলল।

সৌম্য আর একবার উঠে ঘুরপাক খেল। তারপর বলল, লাবু-পিসির আর কেউ নেই না?

না!

তাহলে বল না মাকে সুদ্ধ নিয়ে এখানে এসে থাকুক। নিচে তো ঘর খালি পড়ে রয়েছে। তোমার একটা ভালমতো কম্পানী হয়।

প্রবাসজীবন ছেলের এই ছেলেমানুষি কথায় একটু হাসলেন। বিজ্ঞের মতো কথাই বলতে শিখেছে।

হেসে বললেন, তোমার এ কথাটাও বেশ বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন হলো কী বাবা?

বাঃ কেন নয়? এমন কী কেউ থাকে না? ইচ্ছে করলে উনি সেপারেট ব্যবস্থা—মানে বিধবা তো! আলাদাটালাদা করতেই হয়। একবার বলে দেখলে পারো। তোমার উপকারের আশায় বলছো এইভাবে বলবে। তাহলে—

প্রবাজীবনের মধ্যে যেন একটা পরম আহ্লাদের ঝিলিক খেলে গেল। কিন্তু সে তো ক্ষণিকের জন্য।

ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে একবার ধূসর দৃষ্টিতে তাকালেন। তারপর বললেন, ডেকে এনে সম্মান সমাদরের সঙ্গে রাখতে পারবো এ গ্যারান্টি কী আছে আমার কাছে?

সৌম্য চুপ করে গেল।

সৌম্যর চোখের সামনে একটি লিপস্টিকে রাঙানো ওষ্ঠের বিদ্রূপে বঙ্কিম রেখাটি ভেসে উঠল।

সৌম্য নিজের সারাদিনের অনুপস্থিতির কালটির শূন্যতাটি দেখতে গেল। আর ওই দেখাদেখির ফলে বুদ্ধিমান সৌম্য হঠাৎ একটা বোকার মতো কথা বলে বসল।

বলল, দেবুটাই তোমায় ডোবালো।

হয়তো ওর বক্তব্য ছিল দেবুটাও অন্তত প্রবাসজীবনের একটা পৃষ্ঠবল। প্রবাসজীবনের নিজস্ব একটা লোক।

কিন্তু সৌম্যজীবনের এই কথাটায় প্রবাসজীবন হঠাৎ হাহা করে হেসে উঠলেন।

বললেন, তাহলেই বোঝো অবস্থা। শাঁকরাইল গ্রামের দেবু মাইতি কেয়াতলার প্রবাসজীবন সেনকে ডোবাবার ক্ষমতা ধরে, হা হা হা!

সৌম্য অপ্রতিভ হলেও, জোরের গলায় বলল, ভীষণ অসুবিধেয় ফেলল, সেই কথাই বলছি। সবসময় বলতো বাবু থাকতে দেবু কখনো এ বাড়ি ছাড়বে না। আর এখন কিনা ছুটি নিয়ে দেশে গিয়ে বাবু পত্রাঘাত করলেন, আর ফিরবেন না। দেশেই চাষবাস করে বসবাস করবেন। যাই বল, মোটেই ভাল কাজ করেনি।

প্রবাসজীবন বললেন, সেটা আমাদের দিক থেকে বলছি। কিন্তু ভেবে দ্যাখ সে একটা রক্তমাংসের মানুষই তো। নিজের দিকটা দেখবে না? এখানে তার কী বা চাকরী, কী বা পোজিশান। বাবুর বাড়ির খিদমদগার। জুতো ঝাড়া চাকর। আর সেখানে সে আস্ত একটা মানুষ। বিয়েতে শ্বশুরের কাছ থেকে দু বিঘে চাষের জমি পেয়েছে, নাকি বছরে দুবার ফসল ওঠে। শ্বশুরের ছেলে নেই, ও তার ছেলের মতো হয়ে দেখাশুনো করবে। সেখানে মা ভাই, দেশ ভিটে, নতুন বিয়ের বৌ, ওদিকে জামাই আদর। হা হা হা! সামান্য একটু কথা রাখার দায়ে এ জীবনটা ফেলে চলে আসবে? মহাত্মা না কী? হা হা হা!

খবর সৌম্য বড় তরফের কাছে শুনেছে।

দিব্য বলেছিল, তার মানে বাবু ঘরজামাই হতে গেলেন বুঝলি?

আর চৈতালী বলেছিল, হুঁ। বরং বলো শ্বশুরের খামারে বিনা-মজুরির মজুর খাটতে গেল।

তবে দেবু না ফেরায় সাংসারিক অসুবিধা তেমন ঘটেনি, যেমন অসুবিধে ঘটেছে প্রবাসজীবনের।

প্রবাসজীবন বললেন, তোর দাদা যা রগচটা, একটা পরামর্শ করতে যাওয়াও তো বিপদ। তোর মাথাটা ঠাণ্ডা বলে তোর সঙ্গে পরামর্শ করতে গেলাম, তুই আমায় স্রেফ মাথাখারাপ বলে উড়িয়ে দিলি। কী আর এমন ক্ষতি হতো বল?

সৌম্য একটু তাকিয়ে গভীর গলায় বলল, ক্ষতি তোমার হতো কি না জানি না তবে তোমার ছেলেদের হতো। লোকের কাছে মুখ দেখানোর উপায় থাকতো না তাদের।

প্রবাসজীবন একটি নিশ্বাস ফেললেন।

বললেন, তুইও তো বিয়েটিয়ে করলি না। বাড়িতে আর একটি বৌ থাকলেও—

হঠাৎ চমকে থেমে গেলেন প্রবাসজীবন। কী সর্বনাশ! কী বলে বসছেন! দেয়ালের সর্বত্র যে 'কান' আছে সেটা একদম ভুলে যাচ্ছিলেন।

সৌম্য বাবার ওই থেমে যাওয়ার কারণটা বুঝল না। ভাবল আবেগ। হেসে ফেলে বলল, তা হলে তো অবস্থা আরো ঘোরালো। তখন যাকে বলে সাঁড়াশি আক্রমণ।

*　　　*　　　*

রাত্রে খাবার টেবিলে বসেছে দিব্য, সৌম্য আর চৈতালী। কেন কে জানে চৈতালী এই দ্যাওরটিকে বেশ নেকনজরে দেখে। তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য তো করেই না বরং একটু আঁতাত রাখতেই চেষ্টা করে। তাই সৌম্যর ফিরতে যত দেরিই হোক, খাবার টেবিলে অপেক্ষা করে। এবং টেবিলে রাখা খাদ্যসামগ্রী নিজেই গুছিয়ে পরিবেশন করে। ভূষণ শুধু টেবিলে এনে রেখে দিয়ে খালাস।

বেছে বড় মাছ হুটো বাটিতে তুলে এগিয়ে দিয়ে চৈতালী বলল, আজ তো দেখলাম একটা রেকর্ড করেছ।

রেকর্ড কিসের?

এই তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার। সন্ধ্যের আগেই—

সৌম্য বলল, আর বলবেন না, এ রকম সাধু সংকল্প রোজই থাকে। কিন্তু কী যে হয়ে যায়। কাটুম কাটামের সঙ্গে তো কতদিন দেখাই হয় না। ঘুমিয়ে পড়ে। আর বাবার সঙ্গে তো—

একটু হেসে কথায় ড্যাশ টেনে দিয়ে ছেড়ে দিল।

সৌম্য বাবাকে 'তুমি' করে, এবং বছর পাঁচেকের বড় দাদাকে 'তুই' করে কথা বললেও, দাদার বৌকে আপনি বলে।

প্রথম প্রথম দিব্য বলেছে, আরে ওকে আবার আপনি মশাই কেন?

সৌম্য বলেছে মহিলার সম্মান।

ওটাই চালু রেখেছে। তবে কথাবার্তায় সহজ হালকা চালটি থাকে। এখনও রয়েছে।

কিন্তু মুখোমুখি বসা দিব্যজীবন নামের লোকটা এই সহজালাপের দৃশ্য দেখে রেগে তো গেলই অবাকও কম হলো না।

এই মহিলাই না এতক্ষণ সাপিনীর মতো ফুঁসছিলেন। ওঃ! কী দারুণ অভিনয় ক্ষমতা। দিব্যর আবার ও বস্তুটা একেবারেই নেই। ধৈর্য ধারণেরও না।

দিব্য অতএব এই মুহূর্তেই বলে ওঠে, সে আক্ষেপটা বোধহয় আজ একটু মিটেছে?

মানে?

মানে খুব তো মজলিশ চলছিল। হাসির শব্দ আকাশে উঠছিল। তো আজকের বৈঠকে—কি স্থির হলো?

সৌম্য একবার কর্তা গিন্নী হুজনে মুখের দিকে তাকিয়ে বেশ কৌতুকের গলায় বলল—কথা বলার লোকের অভাবে 'বুড়ো ভদ্দর-লোকের' প্রাণ হাঁফায়, তাই ওনার চারটি বুড়োর দরকার। আর

সেই বাবদ আমার কাছে আর্জি জানিয়েছেন একটা 'ওল্ড হোম' যোগাড় করে ফেলতে।

না, চমকে উঠল না দিব্য। কোনো অবাক প্রশ্নও করল না। শুধু ক্রুদ্ধ গলায় বলল, ওঃ! তা উনি ওনার স্বোপার্জিত অর্থে তৈরী এই অট্টালিকা ছেড়ে 'হোমে' যেতে যাবেন কেন? বরং যাদের জন্যে অসুবিধে ঘটছে তারাই পথ দেখবে। উনি ওঁর বাড়িতে 'আপনজনেদের' আনিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে সুখে সুবিধেয় থাকুন।

সৌম্য দাদার মুখের দিকে তাকাল।

তারপর ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'ভদ্রলোকের' আসল অসুবিধেটা কোথায় জানিস দাদা? সবসময় প্রতিটি ব্যাপারে ওর ওপর আড়ি-পাতা হয়। স্রেফ নজরবন্দীর অবস্থা। প্রাণ পালাই পালাই করতেই পারে। অথচ ব্যাপারটা একটা অর্থহীন খেলোমি ছাড়া আর কিছু না।

মাছের বাটিটা টেনে নিয়ে খাওয়ার মন দেয়।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে হাতের বইখানা মুড়ে রেখে সৌম্য সেই কথাটাই ভাবতে থাকে, কেন এই খেলোমি। কেন একটা নিরীহ নির্বিবাদী ভদ্রমানুষকে সবসময় অবজ্ঞা আর অপদস্থ করার চেষ্টা?

হ্যাঁ, 'গুরুজন' বলে 'পূজনীয়' বলে না মানো, একজন ভদ্রমানুষ বলে তো মানবে? উনি তো কই নিজ অধিকার বলে কর্তাগিরিও করতে আসেন না। তোমাদের এই আরাম আয়েসে থাকা, এই নিশ্চিন্ত শান্তির জীবন, এর অনেকখানি অবদান কি ওই মানুষটির নয়? অথচ—

চুপ করে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে হয়, হয়তো ওইটাই কারণ। ভিতরে ভিতরে একটা ঋণবোধ এনে দিয়েছে খানিকটা কমপ্লেক্স। এখন সর্বদা সেই ঋণদাতাকে চোখের সামনে দেখতে পাওয়া অসুবিধেজনক।

বাবা যদি কর্তাগিরি করতে আসতেন, ওরা ওদের ভেতরের

'পাওয়ার' ভারটা হালকা করে নেবার সুযোগ পেয়ে যেতো বাদ-প্রতিবাদ বিদ্রোহ আর বিরোধিতার মধ্য দিয়ে।

কিন্তু তা হয়নি।

বাবা নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে বসে আছেন।

অতএব ঋণের ভার হালকা করে নিতে এই পথটাই বেছে নিয়েছে ওরা।

সৌম্য একসময় ভাবল, আশ্চর্য তো। আমি ওদের সম্পর্কে 'দাদা বৌদি' বলে ভাবছি না, ভাবছি 'ওরা' বলে। ভেরি ব্যাড।

তারপর মনে করল, আমারও তো দোষ কম নয়। আমি বাবার সম্পর্কে অথবা সংসার সম্পর্কে এতটা নির্লিপ্ত না হলে বোধহয় বাবার মধ্যে এমন একটা হতাশার সৃষ্টি হতো না। মনে হতো না 'আমার জন্য কেউ নেই'।

বাস্তবিকই আমিও কী অকৃতজ্ঞ! বাবার জন্য আমি কতটুকু ভাবি? হয়তো ভাবনার কিছুই থাকত না যদি মা থাকতেন।

যদি মা থাকতেন!

ভাবতেই ভিতরে কেমন একটা আলোড়ন উঠল।

মাকেই বা ক'বার মনে করি?

মায়ের সেই সর্বদা আহ্লাদে ভাসা মূর্তিটি মনে পড়ল। এই বাড়িখানার দেয়ালে দেয়ালে যেন সেই হাসির আলো ছড়িয়ে পড়ত। সৌম্যর মনে পড়ল না আগে, মা থাকতে সংসারটাকে কোনোদিন বিষণ্ণতায় স্যাঁৎসেঁতে দেখেছে। কোনোদিন কোথাও ভার দেখেছে।

আর এখন?

মনে হয় সর্বদাই ভারাক্রান্ত হয়ে আছে সংসার।

খেই হারানো কথাগুলো ভাবতে ভাবতে, আবার জোর করে মনটাকে ফিরিয়ে নিয়ে বইটা বুক থেকে তুলে চোখের সামনে খুলে ধরবার মুহূর্তে বাবার সেই কথাটা মনে পড়ল।

'তোরও যদি একটা বৌ থাকতো।'

কিন্তু এ আবার কী।

কী সর্বনাশ।

কথাটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা লালচেলি পরা মেয়েকে বাবার পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে দেখল।

মেয়েটা কে? কে? কে?

না। এভাবে বাজে চিন্তাকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না।

সৌম্য বইটায় মনসংযোগ করল।

বইখানা হাতে না থাকলে ঘুম আসার কোনো প্রশ্ন নেই।

আর পড়তে পড়তে কখন এতক্ষণের সব চিন্তা ভুলে গেল।

কে জানে কখন ঘুমোলো।

কিন্তু ঘুমের মধ্যেও যেন একটা বিষণ্ণতা লেগে রইল। বেচারী বাবা।

অত্রি আর গৌতম যে হঠাৎ এমন একটা কাজ করে বসবে, তা কেউ ভাবেনি।

হয়তো বা দলের মেয়ে কটা মনে মনে ভেবেছে। এবং বিশেষ বিশ্বস্ত জনের কাছে বলেওছে। তা বলে এক্ষুণি? এত শীগগির?

কিন্তু বিয়ের ফুল ফুটে বসলে আর উপায় কী?

তবে খবরটা শুনে সকলেই আনন্দ প্রকাশ করল, অভিনন্দন জানাল। একদিন 'ভোজের' দাবি করল।

আর সেই সূত্রেই ওরা ওদের বক্তব্য পেশ করল। এ বিয়েতে গৌতমের বাড়িতে অনুমোদন নেই। অতএব আদর করে বৌবরণ করে ঘরে তোলবার প্রশ্ন নেই। ওরা আলাদা একটা ফ্ল্যাট নিচ্ছে। কিন্তু দুজনেই তো বাইরে কাজে বেরিয়ে যায়, বাড়িতে অতএব একটা কাজের লোকের দরকার। এবং অতএব ভবেশ ভবনে আশ্রিত উদয়টাকে নিয়ে যেতে চায়। আর যাই হোক ছেলেটা বিশ্বাসী রয়েছে তো এতগুলো দিন।

সৌম্য বলল, কিন্তু ভুলে যাচ্ছো বোধহয় ও এখনো শিশুর দলে পড়ে, কাজেই—

গৌতম বলল, আরে রেখে দাও তোমার হিসেব। ও যা ওস্তাদ ছেলে অ্যাডাল্টই বলা যায়।

যায় বললেই তো আর সত্যি হয়ে যায় না।

অত্রি বলে উঠল, তার মানে তুমি আমাদের এই সুবিধেটুকু নিতে বাধা দেবে।

কী আশ্চর্য! আমাদের আসল ইস্যুটা ভুলে যাচ্ছ কেন? ভবেশদা—

অত্রি বলে উঠল, এ ক্ষেত্রে 'শ্রমিক' হিসেবেই বা ভাববার কী আছে? আশ্রয়ের অভাবে এখানে একা পড়ে থাকে। এ বরং একটা ভাল বাড়ির মধ্যে বাড়ির ছেলের মতো থাকবে। ভাল খেতে পরতে পাবে। দ্যাখো প্রস্তাবটা শুনলে ড্যাম গ্ল্যাড হয়ে যাবে।

সৌম্য আর প্রতিবাদ করল না। ভাবল হয়তো সত্যিই তাই। মাঝখান থেকে সৌম্যকে বিরোধীপক্ষ ভেবে বিরক্ত হবে।

কিন্তু উদয় নামের সেই ছেলেটা কি 'ভাল বাড়ি, ভাল খাওয়া পরা' এবং বাড়ির ছেলের মতো থাকতে পারার আশ্বাসে ড্যাম গ্ল্যাড হয়ে গেল?

সে অনায়াসে রুক্ষ চুলের বোঝায় ভারী মাথাটা ঝাঁকিয়ে নেড়ে বলে উঠল, না না! উদয় ওই চাকরগিরির মধ্যে নেই বাবা! স্বাদীন জেবন চায় সে।

যেন উদয় একটা অন্য লোক।

গৌতম বলল, ওঃ। স্বাধীন জীবন! তো এখনও তো দেখি চায়ের দোকানে খিদমদগারি করছিস!

উদয় অবহেলায় বলল, সে তো স্বেচ্ছায়, বিনে খাটুনিতে তো আর পেট চলবে না। আমি কাজ করে দিই, ওরা আমায় ভাতের থালাটা ধরে দেয়। ব্যাস মিটে গেল।

গৌতমের বোধহয় ইচ্ছে হলো এই উদ্ধত ছেলেটাকে ঠাশ করে একটা চড় কষিয়ে দেয়। কিন্তু গরজ বড় বালাই। তাই কষ্টে সে ইচ্ছে দমন করে বলল, তো এখানেও তো তাই! আমি তো আর

বলিনি তেকে বসিয়ে খাওয়াবো। আমার কাছেও কিছু কিছু কাজ করে দিবি।

নাঃ। বাড়ির চাকর মানে কেনা গোলাম। বেশ আছি বাবা। আমায় নিয়ে টান মারতে এসো না। আর একটু বড় হলেই রেকশাওয়ালা হবো।

ওঃ! কী উচ্চ আশা!

অত্রি রাগ চাপতে পারে না। এ যেন বাড়া ভাতে ছাই। স্থির নিশ্চিন্ত ছিল ওই ছেলেটাই তার সংসার তরণীর কাণ্ডারী হবে। এমন চৌকস চটপটে একটা ছেলে সহজে আর পাবে? শেষ অবধি একটা 'খুকি ঝি'। কিন্তু তাকে একা বাড়িতে রেখে যেতে হবে। কে সামলাবে তাকে? অথবা তার গুণগ্রাহীদের?

ছেলেটা কী এতও বেয়াড়া?

অত্রি রাগে ক্ষোভে বলে ওঠে, ইচ্ছে করলে আমরা তোকে ওই ঘর থেকে সরিয়ে দিতে পারি তা জানিস?

জানবো না আবার ক্যানো? ভাড়া তো আর দিই না যে জোর আছে!

তাহলে কী করবি? থাকবি কোথায়?

সৌম্য ব্রততী আর আরো যারা ছিল, গৌতমের আর অত্রির খেলোমি আর এই নীচতায় ক্ষুব্ধ হয়। সৌম্য বলে ওঠে আঃ অত্রি কী হচ্ছে?

কিন্তু ততক্ষণে জবাব এসে গেছে।

করব আবার কী? বলেইচি তো ত্যাখন ফুটপাতটা তো কেউ কেড়ে নিতে পারবে না? বল তো আজই চলে যাচ্ছি।

সৌম্য বলল, এই পাগলামি করিস না। এতো বুদ্ধি, আর ঠাট্টা বুঝিস না? যা ভেতরে যা।

সৌম্যর হঠাৎ মনে হলো, মানুষ এত ছোট হতে পারে কী করে?

ব্রততী বাড়ি ফিরে দেখল এক অদ্ভুত পরিস্থিতি।

দরজায় অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি। গাড়ির মধ্যে এক জোড়া শাড়ি

ঢাকা পা। কাকা আর্তমুখে গাড়ির মধ্যে উঠতে যাচ্ছে। অ্যাম্বুলেন্সের চালকরা উঠে পড়েছে।

স্তম্ভিত হয়ে বলল, কী ব্যাপার!

ভেতরে গিয়ে মায়ের কাছে শুনো।

বলে কাকা কোঁচার খুঁট তুলে চোখ মুছতে লাগল। গাড়িটা বেরিয়ে গেল।

ভেতরে এসে দেখল মা কাকীর ছেলেটা আর মেয়েটাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বসে আছে। গালের ওপর অবিরল অশ্রুধারার ছাপ।

ব্রততী কাছেই মাটিতে বসে বলল, মা কী ব্যাপার?

মা ডুকরে উঠে বলল, তোর কাকী বোধহয় চলে গেল রে তুতু। আর কী ফিরবে?

ছেলে মেয়ে দুটোও কেঁদে উঠল।

ব্রততী প্রায় ধমকের মতো গলায় বলল, অ্যাঃ, কী আশ্চর্য! কী হয়েছে তা বলবে তো? কী হয়েছে কাকীর?

মা কপালে করাঘাত করে বলল, যা হয়েছে সে আর এদের সামনে কী বলব? সর্বনেশে মেয়ে সর্বনেশে কাণ্ড করে বসেছেন।

ঠিক আছে। পরে শুনবো।

বলে তিক্তবিরক্ত ও ভীত ব্রততী ঘরের মধ্যে ঢুকে এলো।

তার সঙ্গে সঙ্গে মাও চলে এলো।

এবং গলা নামিয়ে বলল, বাধিয়ে বসেছিলেন একটি কাণ্ড! তো হয়েছেটা কী? মানুষের এমন হয় না? এতো কী বুড়ো বয়স?

মা! প্লীজ একটু সংক্ষেপে বল।

সংক্ষেপ আর কী, এই তো এ বয়েসে আর বাচ্চাকাচ্চা চায় না বলে তোর কাকাকে পর্যন্ত না জানিয়ে কোথা থেকে কী ওষুধ খেয়ে—

বুঝেছি, তুমি চুপ করো মা!

ব্রততী বোধহয় একটা অগ্নিকুণ্ড থেকে পরিত্রাণ পেতেই ঘরে ঢুকে গেল।

এখন প্রচুর জল ঢালবে গায়ে। প্রচুর। জলের কলটা সবটা খুলে দিয়ে গা পেতে দাঁড়িয়ে থাকলো তার নিচে।

* * *

আচ্ছা, সেই 'লাবু' নামের মেয়েটার কী হলো?

হ্যাঁ, তাকে কেন কে জানে 'মেয়েটাই' মনে হয়। 'মহিলার' গাম্ভীর্য দেখতে পাওয়া যায় না তার মধ্যে।

আর সেদিন?

যেদিন সেই পড়ন্ত বেলায় মনে মনে বলে উঠল, 'বাপ অরুণ-কুমার। আর আমি তোমায় ভয় করছি না। চললাম আমি আইন নিজের হাতে নিতে।'

সেদিন তখন তো হঠাৎ তাকে সত্যিই 'নেহাৎ বালিকা' লাগল।

যেন একটা রাজত্ব হাতের মধ্যে এসে গেছে তার।

কারণ লাবুর কাছে অঙ্কটা কেবলমাত্র দুইয়ে দুইয়ে চার।

তোমার মেয়ে যখন আমার ছেলের প্রেমে পড়ে গেছে বাবা তখন আর তুমি আমায় ঠেকাবে কি করে?

তবে হ্যাঁ। মেয়ের ব্যাপারটি তো আর তোলা যাবে না? ঘুণাক্ষরেও না। বেশ তুতিয়েপাতিয়েই বলতে হবে।

ছেলেকে খাইয়ে শুইয়ে অর্ধেক রাত পর্যন্ত জেগে লাবু সেই তুতনোপাতানোর প্রথম বাক্যটির রিহার্সাল দিয়ে চলল।

ছেলে আজও ভার ভার। আচ্ছা বাপধন, আমি তোমার মুখে হাসি ফোটাচ্ছি।

লাবু জানতো দুই আর দুইয়ে চারই হয়। জানতো না দুইকে দুইয়ের পিঠে চাপালে বাইশও হয়।

মিণ্টুর মা আকাশ থেকে পড়লেন।

হঠাৎ পাগলটাগল হয়ে গেলে নাকি নতুন বৌ?

লাবুর ছকে সাজানো ঘুঁটিগুলো ছড়িয়ে পড়ল। লাবু অনেক চেষ্টায় বলল, মেয়েটাকে জন্মাবধি দেখছি দিদি। বড্ড মায়া

পড়ে আছে। মনে মনে ভেবে রেখেছিলাম—অরুণ একটু মানুষ হয়ে উঠলেই আপনার কাছে এসে মিণ্টুকে আপনার কাছ থেকে চেয়ে নেব।

জোলো ভাষা।

বোকাটে ভঙ্গি।

মিণ্টুর মা একটু মধুর হাসি হেসে বললেন, তোমার আমুণ আর কতটা মানুষ হবে ভাই নতুন বৌ?

অতঃপর বোধহয় নতুন বৌয়ের মুখচ্ছবিটি দেখে ঈষৎ করুণা জাগে। তাই নরম গলায় বলেন, আর তাই যদি হয়, কত দিনে হবে সেটাও তো ভাবতে হবে ভাই! এদিকে অমন একখানা সম্বন্ধ এসেছে, তারা কথা দিয়েছে। তোমার ভাসুরের মুখটি কেমন হেঁট হবে সেটিও ভাবো! মিণ্টু তোমার মেয়ের মতো। অরুণের সঙ্গে ভাইবোনের মতন সম্পর্ক। হঠাৎ ওকে বৌ করবার শখ হলো কেন বল তো?

লাবু মরিয়া হলো। কারণ লাবু অনুভব করছে অন্তরালে কেউ এই বাক্যালাপ শুনছে।…এখনই যদি লাবু হাল ছেড়ে দেয় সেই বা কি বলবে?

লাবু তাই বলে উঠল, ভাই-বোনের মতন, সত্যি তো আর ভাইবোন নয়। আমার মনে হয় ওদের দুজনের মধ্যে—

কী হলো গো? থেমে গেলে কেন? ওদের দুজনের মধ্যে কী? 'লভ'? নাটক নভেল পড়া একটু কমাও নতুন বৌ। বাজে চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে সুস্থির হয়ে বোসো একটু। চা খাবে? ওরে মিণ্টু তোর নতুন কাকীমাকে একটু চা দে।

লাবু উঠে পড়ে। লাবু শুকনো গলায় বলে, থাক দিদি। এক্ষুণি খেয়ে এসেছি।

কিন্তু বোকা লাবুর কী এইখানেই শাস্তি শেষ হয়?

লাবুর প্রাণের পুতুল ছেলে সে আকাশের বাজ হয়ে ভেঙে পড়ল না?

মা! তুমি ও বাড়ির জ্যেঠিমার কাছে গিয়েছিলে কাল?

লাবুর মধ্যে আর লাবু বলে কিছু থাকে না।

লাবুর মুখের রংটাও আর লাবুর মুখের রঙে থাকে না।

কী জন্যে গিয়েছিলে?

লাবু কাঠ।

বল? কী জন্যে গিয়েছিলে?

লাবু পাথর।

উঃ! যাবার আগে আমায় একবার জিগ্যেস পর্যন্ত করলে না মা? চুন-কালি মাখিয়ে ছাড়লে আমার মুখে? ভেবে পাচ্ছি না তুমি কোন লজ্জায় তোমার এই একটা আপার ডিভিশান ক্লার্ক ছেলের জন্যে ওই রাজকন্যেকে চাইতে গেলে। শুধু রাজকন্যে? এখন তো আবার রাজরানী হতে চলেছে! উঃ! সব জেনে শুনে হঠাৎ এই মহামুহূর্তে তোমার ঘাড়ে কেন এমন ভূত চাপল মা?

বজ্রে এখন বর্ষণের আভাস।

জ্যাঠা বিশ্বাসই করলেন না আমি এর কিছু জানি না। মিষ্টি মিষ্টি জুতোটি মেরে—

চুপ করে গেল।

সামলে নিয়ে বলল, হঠাৎ কেন এমন খেয়াল চাপলো মা তোমার! উঃ!

লাবু কি তবে এখন চেঁচিয়ে বলে উঠবে, 'ওরে হতভাগা, সেই মেয়েটা যে আমার কাছে শরণ নিতে আছড়ে এসে পড়েছিল। আমি তাকে আশ্বাস দিয়েছিলাম।'

না, তা বলতে পারল না লাবু।

মেয়ে হয়ে আর একটা মেয়ের এই গভীরতম মর্মস্থল, একটা পুরুষের সামনে উদ্ঘাটিত করে মেলে ধরতে পারবে না। মেয়েটার এই অসম্ভ্রম যেন লাবুরই অসম্ভ্রম।

হোক এই পুরুষটি লাবুরই সন্তান, তবু সে লাবুর স্বজাতি নয়। আর ওকে বলেই বা কী হবে? ওই শক্তিহীন ছেলেটা কী কেবলমাত্র

ভালবাসার শক্তিতে মেয়েটাকে তার অভিভাবকদের শক্ত ঘাঁটি থেকে ছিনিয়ে আনতে পারবে?

তবে? বলে ওঠা মানে শুধু নিজেকে বাঁচানো।

ছিঃ!

প্রাণ থাকতে এমন ছোট কাজ করা যায় না। লাবুর ওপর আকাশের বাজ ভেঙে পড়ুক, লাবুর ছেলে লাবুকে তীক্ষ্ণ তীব্র অস্ত্রে ক্ষত-বিক্ষত করুক, লাবু নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করবে না।

লাবু আস্তে বলল, 'হঠাৎ' খেয়াল নয় বাবা। বরাবরের সাধ ছিল ওই বড় ভাল মেয়েটাকে ঘরে আনব। ওর মা বাপের হাতে পায়ে পড়েও ওকে চেয়ে নেব। শুধু একটু সুদিন আসার অপেক্ষায় ছিলাম। হঠাৎ ওর বিয়ের সম্বন্ধের কথা শুনেই মাথাটা কেমন গোলমাল হয়ে গেল। তাই—

আচ্ছা লাবু কি এটা এখন বানিয়ে বলল? নাকি বানিয়ে বলতে গিয়ে লাবু নিজের ভেতরটা দেখতে পেল?

লাবু দেখল এটা বানানো নয়, সত্যি। মনের মধ্যে এই ইচ্ছেটিই লালন করে এসেছে সে।

অরুণ কিছুক্ষণ গুম হয়ে থাকল? অরুণের মনের মধ্যে 'প্রেম ভঙ্গের' জ্বালার থেকেও তীব্র জ্বালা ধরাচ্ছে অপমানের।

জ্যাঠার সেই কথাটা।

জলবিছুটি মারছে।

নিজে সাহস করে বলতে এলে জবাবটা তখনি পেয়ে যেতে বাবা! বোকা হাবা ভালমানুষ মা-টিকে দিয়ে এমন একটা পাগুলে প্রস্তাব করে পাঠানো সঙ্গত হয়নি তোমার। সে বেচারী তোমার জ্যেঠির কাছে না হক্ খানিক হ্যানস্থা খেলো।

উঠোনের ধারে একটা নিমগাছ আছে। দিনের সময় বাতাসে তার পাতাগুলোর ঝিরঝিরিনি দেখা যায়। কী সুন্দর। কী মনোরম লাগে। কিন্তু এখন রাত, এখন পাতাদের আর আলাদা করে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু একটা জমাট অন্ধকার।

তবে নিমফুলের মৃদু আর বিশেষ গন্ধটি জানিয়ে দিচ্ছে এখন মাসটা কি!

অরুণ ঘুম ভাঙ্গার মতোই হঠাৎ 'গুম' ভেঙে বলে উঠল, এবার এখানের বাস ওঠাতে হবে। ওই জ্যাঠার বাড়ির সামনে দিয়ে ছাড়া স্টেশনে যাওয়া আসার দ্বিতীয় পথ নেই।

লাবু কোনো কথা বলল না।

লাবুর মধ্যেও কি অপমানের জ্বালা আগুনের মতো জ্বলছে না? তার সঙ্গে জ্বলছে মিণ্টুর সঙ্গে একবার দেখা করতে না পারার দুঃখ।

ও কি সত্যিই সেদিন আড়ালে কোথাও ছিল? নাকি ও এখনো প্রত্যাশায় দিন গুনছে?

সুনীলার আশঙ্কাই সত্য হলো।

ব্রততীর কাকী আর ফিরল না। হাসপাতাল থেকেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিল।

ব্রততী অবাক হয়ে ভাবে অমন একটা দুঁদে মানুষ, যে নাকি সুনীলার ভাষায় 'ধরাকে সরা দেখত'। হাঁটতো চলতো যেন বিশ্বকে নস্যাৎ করার ভঙ্গিতে, সেই মানুষটা কী তুচ্ছ একটা চক্ষুলজ্জার দায়ে প্রাণটাকে বিসর্জন দিল।

'বুড়ো বয়েসে আবার একটা—'

শুধুমাত্র এইটুকুই কারণ। আর কিছু না।

অবশ্যই এ আশঙ্কা করেনি সে, যে ওইটুকুর জন্যে তাকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। ভেবেছিল চুপিচুপি সব মিটে যাবে। সে লজ্জার দায় থেকে বাঁচবে।

ব্রততী কোনোদিন তার কাকীর ওপর কোনো ভালবাসা অনুভব করেছে বলে মনে পড়ে না। কিন্তু এখন ভীষণ মন কেমন করে তার কাকীর জন্যে।

প্রাণধরে ভাল শাড়িটাড়িগুলো বাড়িতে পরত না কাকী। ইস্ত্রী করা করা এবং নতুন শাড়িরও থাক আলমারির মধ্যে সাজানো পড়ে রইলো।

ব্রততী হঠাৎ যেন দালানের মাঝখানে টাঙানো দড়িতে ভিজে শাড়ি ঝুলতে দেখে। তলায় জল ঝরছে। সুনীলা বলতো, শুধু শুধু নাকি শুকনো কাপড়গুলো ভিজিয়ে ভিজিয়ে মেলে দিত কাকী চোখের আড়াল করতে।

মায়ের কথা ভেবেও মনটা বিষণ্ণতায় ভরে যায় ব্রততীর। মা বলে নির্ভর করার মতো, মা বলে সশ্রদ্ধ ভালবাসা নিয়ে ভালবাসবার মতো মা ব্রততীর ভাগ্যের জন্যে থাকলে কী এমন ক্ষতি হতো জগতের? ব্রততীর মা এত সাধারণ কেন?

গৌতম আর অত্রি ভবেশ ভবনের সঙ্গে সম্পর্কের পাট চুকিয়ে দিয়েছে। আরো যারা আসতো, আসতো সকলেই অনিয়মিত। শুধুমাত্র সুকুমার আসে এবং ভবেশের দোদুল্যমান পায়জামা পাঞ্জাবির সামনে দাঁড়িয়ে সারাদিনের কাজের রিপোর্ট দিতে থাকে, চা আনিয়ে খায়, আর উদয়ের সঙ্গে গল্প করে।

আবার সেই গল্পের সারাংশটুকুও ভবেশদাকে বলতে বসে।

বুঝলেন ভবেশদা! এই যে দেখতে পাচ্ছেন তো একটা বস্তিরই ছেলে, সে কীরকম জ্ঞানের কথা বলে? বলছে, ওসব দোর দোর ঘুরে ধম্মো কতা বলে মন পাল্টানোর চেষ্টা ছেলেখেলা দাদাবাবু। অন্য বুদ্ধি বার করো এতে তোমার সাতজন্মো ঘুরে আসতে হবে।... তবু আমি আপনার আদর্শ ছাড়িনি ভবেশদা। আজ একজনকে রাজি করিয়েছি, সে তার ছেলেদুটোকে ইস্কুলে পড়তে পাঠাতে রাজি হয়েছে। একটা লোকেরও যদি মন বদলায়, সেটাই কী কম লাভ ভবেশদা? আপনি তো তাই বলতেন।

উদয় সুকুমারকে বলে 'পাগলাবাবু'।

সুকুমার বলে, মায়ের জন্যে তোর মন কেমন করে না উদয়?

করলে বা কী করচি? তবে একটুক সুখে স্বাচ্ছোন্দে আচে এই ভেবেই আহ্লাদ। কিছু না হোক, খেতে তো পাচ্ছে।

সেটা কি করে জানলি?

জানি, কেষ্টকাকা লোক ভাল। মায়ের ওপর ওর বরাবর ভক্তি। তবে সাদ হয় বাপটাকে কেউ একদিন খুন করুক।

অ্যাঁ, কী বললি?

যা সাদ হয় তাই বললুম। অমন মন্দ লোকের পিথিমীতে না থাকই ভালো।

এ পাড়ায় অনেক বাড়িতেই কর্পোরেশনের কলে জল ওঠে না। কিছু ভারী পাড়ায় ডিপ টিউবওয়েল থেকে জল বয়ে বয়ে গেরস্তকে সাপ্লাই দেয়। উদয় কেমন করে যেন ওদের দলে মিশে গেছে। এই এক-দেড় বছরের মধ্যেই বেশ শক্তপোক্ত দেখতেও হয়ে গেছে। কাঁধে বাঁক বইতে পারে না, বালতি করে করে জলের যোগান দেয়।

অর্থাৎ যে ভাবেই হোক নিজের ভাতের খরচাটা সে নিজে উপার্জন করে।

ব্রততী বলেছিল, একে বা এদের মতনদের তুমি কী করে আটকাবে সৌম্য? এরা জন্মাবধিই জানে, তাকে কিছু করতে হবে।

সেদিন রাস্তায় চলার সময়—এইসব কথা বলতে বলতে সৌম্য হঠাৎ বলে উঠল, আচ্ছা ব্রততী, তোমার কী মনে হয়, সুকুমারের মধ্যে পাগলামি বাসা বেঁধেছে?

ব্রততী একটু হাসল।

বলল, আমার কী মনে হয় তা আর শুনে কী হবে?

বলতে বাধা থাকলে অবশ্য শুনতে চাই না।

পথ চলতে চলতে গাঢ় চোখ তুলে তাকানো হয় না। গলার স্বরেই সেই গাঢ় ছাপ।

তোমার কাছে আবার বাধা!

তারপর একটু হেসে বলল, আমার মনে হয়, এ এক ধরনের আত্মমোহ। যা আত্মছলনার নামান্তর। ও নিজেই নিজেকে এভাবে দেখতে চায়। অন্ততঃ আর দশজনের মতো নয় ও, এইটা ভাবতে ভাল লাগে ওর। এটাই এখন নেশায় দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।

আর একটু হাসল।

আসলে অনেকের মধ্যে এমন একটা শখ থাকে। 'অ-সাধারণ' হতে না পেরে উঠলে অ-স্বাভাবিক হবার সাধনা করে।...অবশ্য এটা হচ্ছে আমার নিজস্ব ধারণা। এই ধারণাতেই ভাবি এদের মতোনরাই ওই একটা তীব্র ইচ্ছের প্রেরণায় 'স্বপ্নাদেশ' পায়, 'ঠাকুর' পায় জনসমাজে একটা 'অলৌকিকের' ছাপ গায়ে মেরে ধর্মকথা শোনায় আর হয়তো বা মাদুলি, কবচ, জলপড়া দিতে শুরু করে। তবু বলবো এটা যে ঠিক ধাপ্পাবাজি ভণ্ডামির কোঠায় পড়ে তাও নয়, অনেকটা আরোপিত ব্যাপার। নিজেই বুঝতে পারে না 'কি করছি'। খুব বেশী আশ্চর্য হবো না সৌম্য, যদি হঠাৎ কোনোদিন দেখি, সুকুমার কোনোদিন রাস্তায় দাঁড়িয়ে ধর্মবক্তৃতা দিচ্ছে। অর্থাৎ জেনে বুঝে 'ভান' নয়, 'ভান' করার একটা প্রবল ইচ্ছে। শেষ অবধি নিজেই সেই ভানের শিকার হয়ে পড়ে।

সৌম্য হেসে বলল, এই সব নিয়ে এত ভাবনাটাবনা করো কখন?

বসে বসে অথৈ ভাবনা ভাবি না। অবশ্যই মাঝে মাঝে এই ধরনের ব্যাপার চোখে পড়লে মনে হয়। মনে হয় এরা সবাই ঠিক ব্যবসাদার ভণ্ড হয়তো নয়। 'একটা কিছু' 'বিশেষ কিছু' হবার জন্যেই এমন উল্টোপাল্টা পথ ধরে বসে।

সৌম্য হেসে বলল, তাহলে তো দেখছি সুকুমারকে একটু ওয়াচ করতে হবে।

এসে গেল বাস স্ট্যাণ্ডে। সৌম্যর মনে হলো ভবেশদার বাড়ি থেকে বাস স্ট্যাণ্ডটা তো একটু দূরেই ছিল। হঠাৎ যেন খুব কাছে সরে এসেছে মনে হচ্ছে।

ব্রততী বাড়ি ফিরেই অনুভব করল বেশ জোরতলবে রান্না চলছে। ফোড়নের গন্ধ, খুন্তি নাড়ার শব্দ। তার সঙ্গে মানুষের কণ্ঠস্বরও ধ্বনিত হচ্ছে।

এখন আর দালানের মাঝখানে দড়ি টাঙানো নেই, এখন আর দুদিকে দুটো রান্নাঘরের প্রশ্নও নেই। সব রান্নাই সুনীলার ঘরে।

কাকার এক অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে গেছে। ব্রততী দেখে, কাকা যেন তার বৌদির এই মহানুভবতায় বর্তে গেছে, বিগলিত হয়ে গেছে। বৌদির এই—তার সংসার তরণীর হালটি নিজের হাতে তুলে নেওয়ায় পূর্ণেন্দুর গায়ে কোনোরকম বিশৃঙ্খলার 'আঁচটি' না লাগায়, এবং ছেলে-মেয়ে দুটো প্রয়োজনের অতিরিক্ত মায়া যত্ন পাওয়ায় সে যেন হিসেব মিলিয়ে উঠতে পারছে না। কৃতকৃতার্থ হয়ে যাচ্ছে।

এখনো এসে দেখল মা রান্নাঘরের মধ্যে আর কাকা রান্নাঘরের দরজার সামনে একটা মোড়ায় বসে কথা বলছে কৃতার্থমন্যের ভঙ্গিতে।

কাছেই ছোট একটা মাদুর পেতে খুকু আর বাবুয়া পড়াশুনো করছে।

মা মারা গিয়ে পর্যন্ত ওরা আর পড়ার ঘরে বসে পড়তে পারে না। শোবার ঘরেও না। যতক্ষণ না বাবা বাড়ি ফেরে, জ্যেঠিমার কাছাকাছিই ঘুরঘুর করে। গা ঘেঁষে বসে জ্যেঠির কাছে গল্প শোনে।

আর কাকা অবিরত 'হা বৌদি' 'জো বৌদি' করে।

ব্রততী কেমন যেন অবাক অবাক।

একদার কটু ভাষণগুলোর স্মৃতি মনের মধ্যে কী সামান্যতমও লজ্জা এনে দেয় না?

কাকার ভঙ্গি দেখে মনে হয় না জীবনে কখনো কোনোদিন এই রান্নাঘরে ছাড়া অন্য কোনো রান্নাঘরে খেয়েছে। যেন আবাল্যের ব্যবস্থাটিই অবিচ্ছিন্ন ভাবে চালু আছে। যেন মাঝখানে একটা মস্ত 'গ্যাপ' নেই।

আগে এক এক সময় মা দুঃখ করে বলতো, নতুন বৌ হয়ে এসে সমবয়সী দ্যাওরটির সঙ্গেই ছিল যত রাজ্যের গল্প। গল্প আর ফুরোয় না। আর এখন সেই মানুষ আমার সঙ্গে কথা কয় না। কয় যদি তো শুধু কূটকচালে কথা।

ব্রততী বলেছে তখন, এতো কী গল্প হতো বাবা?

মা বলতো, সে কী আর মনে আছে? না তার মাথামুণ্ডু আছে?

তোর কাকাই বাইরে থেকে নতুন নতুন হুজুগের কথা নিয়ে আসতো। তখন সবে নতুন কলেজে ঢুকেছে। নিজেকে লায়েক ভাবতে শিখেছে, নতুন নতুন বন্ধু জুটেছে। কত কথা। কী হাসিখুশী ছিল।

খুবই হাসিখুশী যে ছিল কাকা তা ব্রততীরও তো শৈশব বাল্যের স্মৃতিতে রয়ে গেছে।

মা নিঃশ্বাস ফেলে বলেছে, ওই যে একখানি ব্যাজারমুখী 'বান্ধবী' জুটলেন। মানুষটাকে একদম পাল্টে দিল।

ব্রততী ইদানীং পুরনো বাড়ির দরজাতেই একটা নতুন লক বসিয়ে নিয়েছে। তার একটা চাবি নিজের কাছে রাখত। কারণ কিছুদিন আগে পর্যন্তও তো দরজা খুলতে কাকাকেই নিচে নেমে আসতে হতো। ছিটকিনি উঁচুতে—খুকুর হাত যায় না।

দরজা খুলে দিয়েই কাকা যে কেমন একটা তিক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে সরে যেত, ব্রততীর মনটাও তেতো হয়ে যেত।

এখন নিজে চাবি খুলে ঢুকে আসে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসার পর মা বলে ওঠে, ওমা। এসে গেছিস। হঠাৎ দেখে চমকে গেছি।

আজ আর তা' হলো না।

ব্রততী সিঁড়িতে উঠতে উঠতেই শুনতে পেল, মা বলছে, বাইরেই একটু রাগী ঝাঁজি জেদি ছিল, ভেতরটা ভাল ছিল।

ব্রততী বুঝল, কাকা বিষয়ক প্রসঙ্গ হচ্ছে।

মার গলার 'তোয়াজি' স্বর।

এও এক রহস্য। মা ওদের তোয়াজ করে ছাড়া কথা বলতে পারে না।

ব্রততী কাকার গলার স্বর শুনতে পেল।

সনিশ্বাস অভিব্যক্তি। এখন তাই ভাবি। তো বরাবর ওকে তুমিই বেশি বুঝতে।

মায়ের গলার স্বরে বেদনা বিষাদ। ভরা ঘরে দোর দিয়ে চলে গেল। কত সাধ কত বাসনা।

হ্যাঁ, বলেছিল এ বছর পূজোর ছুটিতে দেশ বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে।

আর পৃথিবীর কোনো দেশে বেড়াতে যেতে হলো না।

ব্রততী বুঝল এখন স্মৃতিচারণ চলছে।

বিষণ্ণ বেদনাবিধুর কণ্ঠের আধা-দার্শনিক সব উক্তি। দুটি বন্ধু মানুষের মধ্যে।

ব্রততী দালানের সীমান্তে ছেলে-মেয়ে দুটোর কাছ বরাবর এসে ব্যাগ থেকে দুখানা চকোলেট বার করে খুকু আর বাবুয়ার দিকে বাড়িয়ে ধরলো।

ওমা! দিদি!

ইস! দিদি! তুমি কী ভালো। আবার আজ চকোলেট। পরশুরটাই তো এখনো রয়েছে একটু।

এ মা! সে কীরে! চকোলেট আবার কেউ অর্ধেক খেয়ে তুলে রাখে নাকি?

বাবা যে বলল, সবটা খাচ্ছিস?

দূর। সবটা খাবি না তো কী?

কাকা এখন বলে উঠলেন, রোজ রোজ এত বাজে খরচ করিস কেন বাবা?

বাজে খরচ আবার কী। চকোলেট তো বাচ্চাদের জন্যেই।

মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল।

মায়ের হাতে প্লেটে সাজানো জলখাবার।

কাকার সামনে নামিয়ে দিয়ে বলে উঠল, তুই এসে পড়েছিস, ভালই হয়েছে, আয়, গরম গরম ডালের বড়া ভেজেছি। তোর কাকা মুড়ির সঙ্গে খেতে ভালবাসে। ভাল লাগলে বোলো ভাই আর চারটি দেব।

ব্রততী তাকিয়ে দেখল মায়ের মুখে একটি প্রসন্ন পরিতৃপ্তির স্নিগ্ধতা। একটু আগে যে বিষণ্ণ স্মৃতিচারণ চলছিল, তার কোনো ছাপ নেই মুখে।

ব্রততী যেন নতুন করে মাকে দেখল। .

দেখে অবাক অবাক লাগল।

তবে কি মা সংসারের এই অন্য পরিস্থিতিতে সুখী?

ভাবতে কষ্ট লাগছে, তবু না ভেবে পারছে না।

হ্যাঁ। না ভেবে উপায় নেই। বড় স্পষ্ট প্রত্যক্ষ। সংসারের এই ভাঙাগড়ার ছাঁচটা মাকে যেন অফুরন্ত কর্মশক্তির যোগান দিচ্ছে। মনে হতো মা বুড়িয়ে গেছে। এখন আর তা মনে হয় না।

নতুন করে সাজাচ্ছে গোছাচ্ছে রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর।

দিনে চারবেলাই আহার পাত্রে নতুন নতুন আয়োজন। কাকা যা যা খেতে ভালবাসে তার সবগুলোই যেন পরপর না খাওয়ালেই নয়।

খুকু বাবুয়াকেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত যত্নের চোটে অস্থির করে তুলছে। হাতের কাজ ফুরোলেই বলে, কীরে পড়া সেরে নিয়েছিস? আয় গল্প শুনবি।

মা ওদের খাইয়ে শুইয়ে মশারি টাঙিয়ে দিতে যাবে, রাত্তিরে তেষ্টা পেলে ঘরে জল আছে কি না দেখবে। কাকা যতই বলে, এসব তো আমিই বরাবর করি বৌদি।

মা বলবে, তুমি থামো তো? এ সব কি পুরুষ মানুষের কাজ?

মায়ের গলার স্বরে যেন উৎফুল্ল ভাব।

ব্রততী একটা নিশ্বাস ফেলল।

না মানুষটার ওপর রাগ এল না। বিতৃষ্ণাও নয়। এল একটা করুণা।

সংসার করার বড় বাসনা সুনীলার।

বড় বাসনা 'প্রয়োজনীয়' হবার।

সে বাসনা অপরিতৃপ্তিই রয়ে গেছে তার।

আর সংসার?

সেই বা কোথায়?

রাঁধবে বাড়বে খাওয়াবে মাখাবে, যত্ন করবে, জোর করবে, এমন মানুষ কোথায় সুনীলার জীবনে?

এখন এ যেন একটা ভূমিহীন কৃষক, দৈবাৎ মুফতে বৃহৎ একখণ্ড জমি পেয়ে গেছে।

মুখে চোখে সেই প্রাপ্তির ছাপ পড়বে বৈকি?

চেষ্টাকৃত বিষণ্নতা আর কষ্টকল্পিত স্মৃতিচারণে কি সে ছাপ ঢাকা যায়?

কিন্তু সংসার করা মানে কী?

তা ওই সুনীলাদের একটাই মানে। সংসার করা মানে কুটনো কোটা বাটনা বাটা রুটি বেলা রান্না করা খাওয়ানো মাখানো।

সংসার করা মানে রোদের সময় বড়ি আচার আমসি বানিয়ে রেখে বর্ষার সময় কাজে লাগানো, সংসার করা মানে শীতের আগে চালি থেকে লেপ কম্বল নামিয়ে রোদে দিয়ে রাখা, শীতের শেষে আবার রোদ খাইয়ে তুলে ফেলা।

সংসার করা মানে হাঁড়ি-কুড়ি হাতাখুন্তি বাসনপত্রের ওপর আধিপত্যের সুখ।

অতএব সুনীলা এখন সংসার করতে পাওয়ার সুখ পাচ্ছে।

ব্রততী তবে সুনীলা নামের একটু সংসার করতে পেয়ে কৃতকৃতার্থ মানুষকে করুণা ছাড়া আর কী করবে?

কিন্তু ব্রততীর যে এই আবহাওয়ায় প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।

* * *

আবার একদিন চমকে উঠল দিব্য।

বলে উঠল, মাই গড্। বল কী? আবার একটা বিয়ে করে বসেছে তোমার কঙ্কণাদি।

চৈতালীর মনের মধ্যে যাই হোক, মুখে জোরালো গলায় বলে ওঠে, তা এতেই বা এত আকাশ থেকে পড়ার কি আছে? চিরজীবন কী ও বন্ধুর বাড়ি পেয়িং গেস্ট হয়ে থাকবে? এর একটা স্থিতি চাই না? একটা জীবন চাই না?

তা অবশ্য ঠিক।

চৈতালীর কথা যুক্তিহীন নয়।

সেই যুক্তিতে আরো জোর যোগান দেয় চৈতালী, জানো, এত বড় শহরে একটা ভদ্রমতো লেডিস হোস্টেলে একটা সিট পায়নি কঙ্কণাদি। কোথাও ঠাঁই নেই। ওয়েটিং লিস্টে অগাধ নাম।

তা যাক। শেষ পর্যন্ত একটা আস্তানা জুটে গেছে তো? তো পাত্রটি কে?

কে তা আমি কী করে জানব? তবে শুনলাম বড় একটা মার্চেন্ট। পয়সাকড়ি বিস্তর।

বাঙালী? না কি অবাঙালী?

চৈতালী রেগে বলল, জানি না। যদি অবাঙালীই হয়? এসে যাবে কিছু? এই সাম্প্রদায়িক মানসিকতাই আমাদের ইয়ে করে রেখেছে।

'কিয়ে' করে রেখেছে তা আর বলে উঠতে পারল না চৈতালী।

দিব্য গালে রেজারের টান মারতে মারতে বলল, তা তুমি কী তোমার কঙ্কণাদির এই নতুন পতিগৃহে বেড়াতে যাচ্ছ?

যাচ্ছি? চমৎকার। একা একা কোথাও যাই আমি?

না মানে, একটু আগে টেলিফোনের আলাপে শুনতে পেলাম কিনা ওই রকম কী একটা।

ওঃ। টেলিফোনে আড়ি পাতা হয়?

কী মুস্কিল। যাওয়া যাওয়া মতো কী যেন?

সবই তো শুনেছ। ন্যাকা সাজছো কেন? কঙ্কণাদি বলছিল, গাড়ি পাঠিয়ে দেবে আমায় যেতে হবে। কবে তোমার সুবিধে হবে সেটা বলে দিলেই—

দিব্য মনে মনে বলল, 'যেতেই হবে'। এমন কোনো বাধ্য-বাধকতা আছে নাকি?

মুখে বলল, আহা যাক না আর কিছুদিন। এখন ওনাদের হনিমুন টাইম। বাজে লোক গিয়ে ডিসটার্ব করা—

চৈতালী মুচকি হেসে বলল, ডিসটার্ব কী? এই টাইমটাই তো লোক ডেকে দেখাবার।

যাই বলো 'বড়লোক' নামেই আমার ভয় ভয় করে।

কী? ভয় ভয় করে? বড়লোকেরা তোমায় কামড়াতে আসে?

দিব্য হেসে ফেলে বলে, তা প্রত্যক্ষে না হোক পরোক্ষে। মনের মধ্যে কেমন যেন একটা কামড় কামড় লাগে।

হিংসুটেদের স্বভাবই ওই। ওটা ঈর্ষার জ্বালা।

তা যদি বল তো তাই। তবে আমি তা ভাবি না। আমার ওই কেমন যেন অস্বস্তি লাগে। তোমার মতো সহজে খাপ খাইয়ে নিতে পারি না। ওদের বাড়ি গিয়ে ডানলোপিলোর সোফায় ডুবে বসে থেকে নিজের হাত পাগুলোকে নিয়ে কী করব যেন ভেবে পাব না। কেবলই মনে হবে বোধহয় আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। বোধহয় হাসছে মনে মনে।

এর নামই হীনমন্যতা। তোমার ভাবভঙ্গি দেখলে মনে হয় বড়লোকরা যেন একটা আজব চীজ! আর বড়লোক হওয়াটা যেন একটা সামাজিক অপরাধ।...বড়লোক হয় লোকে নিজের ক্যাপাসিটিতে বুঝলে? যার সে ক্যাপসিটির বালাই নেই, তারাই 'বড়লোক' বলতে নাক কোঁচকায়। নয় তো ভয় পায়। একটা লোক একটা ডিভোর্সি মেয়েকে বিয়ে করেও তাকে মহারানীর মতো রাখছে, এই মানসিকতাটি প্রশংসাযোগ্য নয়? মন কত উদার হলে—

দিব্য মনে মনে যা বলল, তা মনের মধ্যেই থাকা ভাল। মুখে বলল, খুব বেশি প্রেমে পড়ে গেছে আর কী।

সেটা তো নিশ্চই। কঙ্কণাদির মতো আর একটা মেয়ে চট করে বার করো দিকি।

সমান্তরালভাবে মনে এবং মুখে কথা চলতে থাকে।

(আমি তো গুণের বালাই মাত্র দেখি না। যত ইচ্ছে সাজতে পারা, যত ইচ্ছে ঢং করা, বেদম সিগারেট খাওয়া যদি গুণ হয় তো গুণ। আমি ঘেন্না করি অমন গুণকে।)

সে তো অবশ্যই। খুব ঠকে গেলেন তোমার জামাইবাবু।

জামাইবাবুর নাম কোরো না। একটা ছোটলোক।

(বটে না কী ? একসময় তো তোমার কাছে ভদ্রলোকের আদর্শই ছিল ওই জামাইবাবু)

হ্যাঁ! ভদ্রলোক ভুল করেছেন। আহা। এই শহরেই তো বসবাস! যদি চোখে পড়ে যায় তাঁরই একদার গিন্নীটি মস্ত দামী গাড়ি হাঁকিয়ে আর একজনার সঙ্গে হাসি গল্প করতে করতে সাঁ করে বেরিয়ে গেল! ইস।

চৈতালী আর একটু মুখ টিপে হাসল।

যদি কী ? হবেই তো। কঙ্কণাদি তো বলল হেসে হেসে, সেই লক্ষ্মীছাড়াটা যেখানে যেখানে যায় আসে, ঘোরে, সেইখানে সেইখানে বেশী করে যাব! দেখুক আমার দামটা।

গুম গুম করে একটা মালগাড়ি চলে গেল। এরপরই একটা লোক্যাল ট্রেন ছাড়বে। কিছুক্ষণ পরে আর একটা। সকালের দিকে পর পর বেশ কয়েকটা ট্রেন ছাড়ে।

অরুণ ভারী স্যুটকেসটাকে নিয়ে হাত বদল করতে করতে দ্রুত আসার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ চোখকে অবিশ্বাস করে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ঠিক দেখল।

কিন্তু ভুল দেখার প্রশ্নই কি আছে ?

টিকিট ঘরের সামনের লাইন থেকে বেরিয়ে এল মিণ্টু, কেনা টিকিট হাতের ব্যাগের মধ্যে পুরতে পুরতে। দ্রুত এসে পড়ল কাছে। আর তীক্ষ্ণ তিক্ত একটু হাসির সঙ্গে বলে উঠল, কী এই যে বীরপুরুষ! রণক্ষেত্র থেকে পশ্চাদপসরণের কৌশলটাই বেছে নিলে ?

অরুণ ওই ব্যঙ্গ বাণীতে কান দিল না।

অরুণ হতভম্ব হয়ে বলে উঠল, তুমি এখানে ?

আমিও তো যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।

অরুণ ওর তাপ উত্তাপহীন ভাব দেখে বিচলিত হয়ে বলল, তার মানে ?

মানে অতি সোজা! তোমার সঙ্গে ট্রেনে উঠে পড়ে তারপর তোমার স্কন্ধে ভর। এই তো টিকিট কেটে আনলুম। তোমার তো মাস্থলি আছে। আমার তো নেই। সাতটা পাঁচেরটা বোধহয় এসে গেল। এটায় হবে না। সাতটা বত্রিশেরটায় চলো এগোনো যাক!

অরুণ মিণ্টুর মুখের দিকে তাকাল।

অরুণের হঠাৎ মনে হলো, মিণ্টু যে এতটা সুন্দরী তাতো কোনো-দিন খেয়াল করিনি। কিন্তু এখন মিণ্টুর মুখে ভয়ানক একটা বিপদের সংকেত। এখন তাকিয়ে দেখবার সময় নয়।

এসব কী পাগলামি মিণ্টু। ছিঃ। বাড়ি যাও।

বাড়ি ফিরে যাব ভেবে তো আসিনি। তোমার সঙ্গে যাব ঠিক করেই এসেছি।

ছেলেমানুষি কোরো না মিণ্টু। আমার সঙ্গে যাবে, এর কোনো মানে হয়?

সব্বাই সব সময় মানেওলা কাজ করবে এরই বা মানে কী?

মিণ্টু!

বল।

পাগলামি কোরো না। আমি তো এখন বলতে গেলে অকূলে ভাসতে যাচ্ছি।

আমিও তো ঠিক তাই চাইছি অরুণদা।

মিণ্টু দোহাই তোমার। বাড়ি ফিরে যাও। কে কোথা থেকে দেখে কী ভাববে। জ্যেঠিমার চোখ বাঁচিয়ে এলে কী করে ভেবে পাচ্ছি না।

একটা মেয়ে যখন মরিয়া হয়ে ওঠে অরুণদা সে দুঃসাধ্য সাধন করতে পারে। তুমি যদি এর সিকিও মরিয়া হতে পারতে ঝপ করে আমার হাত চেপে ধরে 'আয়' বলে টেনে তুলে নিতে।

মিণ্টু! আমি তো তোমার বাবার কাছে হাত জোড় করে বলে এসেছি 'আমি গরীব'।

মিণ্টু ঠোঁটটা একটু কামড়ে বলল, সে তো দেখতেই পাচ্ছি। তবু ভাবলুম দেখি ধাক্কা দিয়ে তোমার আসল দারিদ্র্যটা কোথায়! যাক তাহলে সাহস নেই?

স্বীকার করছি মিণ্টু। তোমার জন্যে সুখের সিংহাসন পাতা রয়েছে। আমার মতো একটা হতভাগার সঙ্গে তোমার জীবনকে জড়াতে চাইব কেন? আমি তোমার অশুভ চাই না।

মিণ্টুর মুখটা খুব লাল দেখায়।

কোনটা শুভ কোনটা অশুভ সে জ্ঞান তোমার আছে?

আমার বুদ্ধি মতো আছে।

তুমি—তুমি একটা কাপুরুষ।

মিণ্টুর শাড়ির ওপর থেকেও বুকের দ্রুত ওঠাপড়াটা দেখা যায়।

চারদিকে লোকে লোকারণ্য। কতজন যাচ্ছে আসছে। যাত্রী কুলি কামালি জমাদার।

অরুণ ভয়ানক রকম নার্ভাস হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মিণ্টু নির্বিকার।

আমি যদি তুমি হতুম অরুণদা, সেই পরম ভক্তিভাজন জ্যেঠুজ্যেঠির মুখের মতন জবাব দেবার প্রতিজ্ঞা করতুম অরুণদা।

অরুণ মিণ্টুর এমন তীব্ররূপ আর কখনো দেখেনি। দেখার মতো পরিস্থিতিই বা হয়েছে কই।

গুমগুম করে আবার একটা আওয়াজ উঠল মাটি কাঁপিয়ে।

এটা কি শুধুই ট্রেন ছেড়ে দেবার শব্দ, না মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা দুটো মানুষের মধ্যেও উঠছে ওই আওয়াজ!

মিণ্টু, আমার কী ক্ষমতা আছে উচিত জবাব দেবার? সত্যিই তো বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে চাইলে—

থামো। আর দৈন্য দেখিও না! উচিত জবাব হচ্ছে, যে ভাবেই হোক সৎপথে অসৎ পথে যে করেই হোক টাকা করতুম। তারপর ওই কর্তা গিন্নীর চোখের সামনে তিনতলা বাড়ি তুলতুম। একটা বড়লোকের ঘরের সুন্দরী মেয়েকে ঘরে এনে ওনাদের নাকের সামনে বসতুম।

এই।

একটু বোধহয় হেসেই ফেলে অরুণ।

হাসির কথা নয় অরুণদা! বড়লোক তোমায় হতেই হবে। অন্ততঃ আমার ওই নাক উঁচু বাপ মা-টির নাকে ঝামা ঘষতেও বড়লোক হওয়া চাই।

আর তুমি?

আমি?

মিণ্টুর মুখে আবার একটু তিক্তহাসি ফুটে ওঠে।

আমার কথা তো তুমি বলেই দিয়েছ। সোনার সিংহাসন পাতাই আছে। তাহলে নিয়ে যাচ্ছ না তো আমায়? টিকিট ছিঁড়ে ফেলি?

আহা ছিঁড়বে কেন? এখনো ফেরৎ দিলে—

ও হো হো! তাও তো বটে! হি হি, মিণ্টু চিরদিনের ভঙ্গিতে হি হি করে হেসে ওঠে।

মিণ্টু হঠাৎ এভাবে হাসল কেন?

অরুণ একটু শঙ্কিত হয়ে বলল, মিণ্টু! আমার ট্রেন এখুনি এসে পড়বে। বাড়ি যাও।

তাড়াটা কী?

মিণ্টু লক্ষ্মীটি! আমার খুব খারাপ লাগছে।

ভয় নেই অরুণদা! তুমি ট্রেনে ওঠা মাত্র তার চাকার তলায় আছড়ে পড়ে গলা দিতে যাব না। নির্ভয়ে রওনা দাও। পড়শীর মেয়ের বিয়েতে হয়তো একটা নেমন্তন্ন পত্তর পাবে। ইচ্ছে হলে নেমন্তন্ন রক্ষা করতে আসতেও পারো। চাই কি কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে মাছের কালিয়া ছোলার ডালের বালতি নিয়ে ছুটোছুটি করতে পারো। হি হি। দেখবে আমিও দিব্যি চেলি চন্দন পরে গাঁটছড়া বেঁধে বরের পিছুপিছু গাড়িতে গিয়ে উঠব।

মিণ্টু, আমি তোমার ভাল চাই।

থ্যাঙ্কিউ। এটা তো বলা হয়ে গেছে। আর কবার হবে? বিশ্বাস করছি। হলো তো?

মিণ্টু কথা দাও ভাল থাকবে ?

মিণ্টু আবার হেসে উঠল।

তোমার ডায়লগটা পঞ্চাশ বছর আগের ভ্যাবলা নায়কের মতো লাগল অরুণদা। 'ভাল থাকব' এ গ্যারান্টি দিতে পারছি না, তবে, হঠাৎ কোনোদিন খবরের কাগজের খবর হয়ে যাব না এ গ্যারান্টি দিচ্ছি। মিণ্টু এতো বোকা নয় অরুণদা। জীবন জিনিসটা এতো সস্তা নয়।

অরুণ বিহ্বলের মতো তাকায়।

অরুণ যেন এক অপরিচিতাকে দেখে।

সেই হালকা হাওয়ার মতো উজ্জ্বল কিশোরীটি কখন কোন ফাঁকে এমন প্রগল্‌ভা যুবতীতে পরিণত হয়ে উঠল ?

কতদিন দেখেনি অরুণ মিণ্টুকে ?

মিণ্টু কথার শেষ টান দিল।

কী হলো ? অমন ভ্যাবলার মতো হাঁ করে তাকিয়ে কী দেখছ ? ওই তোমার ট্রেন এসে গেল। এটাকে মিস করলে অসুবিধেয় পড়বে।

মিণ্টু।

কী ?

কথা দিচ্ছ ?

কিসের কথা ? ও; রেললাইনে গলা দেব কিনা ? কিংবা গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ব কিনা, কি গায়ে কেরোসিন ঢেলে দেশলাই জ্বালব কিনা ? নির্ভয়ে থেকো। তবে তুমিও আমার শর্তটা মনে রেখো অরুণদা। বড়লোক হয়ে পড়ো। অহঙ্কারীদের মুখের মতো জবাব দেবার ক্ষমতা রাখো।

গাড়ি এসে চলে গেল।

ভিড়ের মধ্যে অরুণকে আর দেখা গেল না। অরুণ ও মিণ্টুকে না।

একটু পরেই একটা সাইকেল রিকশায় চেপে মিণ্টুর মা বাবা এসে হাজির হলো।

মিণ্টুর মা বলল, তুই ফস করে কখন চলে এলি ? কখন ?

মিণ্টু বলল, বাঃ। তুমিই তো বললে, তোর বাবা তো এখনো বাজার থেকে এল না মিণ্টু, তুই বরং ততক্ষণ টিকিটের লাইনে দাঁড়াগে যা!

বলেছিলাম।

রিকশা থেকে নেমে মাও হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, তো বেরোবার সময় একবার বলে আসবি তো ? সব বুঝিয়ে দিতুম।

বোঝাবার এতো কী আছে ?

বাঃ আমরা বেরিয়ে এলাম, তুই একা খাবি। শোন, দালানে টুলের ওপর ভাত রাখা আছে। আর রান্নাঘরের উঁচু তাকে মাছের ঝোলের বাটি—

আচ্ছা বাবা আচ্ছা সব জানি। দেখেশুনে নেব।

ছাখ না তোর বড়মাসীটিকে তো জানিস। নিজে গিয়ে না বললে মানের কানা খসে যাবে। তাছড়া গয়নাটয়না তো বড়দির স্যাকরাকেই—

জানি জানি। আর কিছু বলার নেই তো ? এই নাও টিকিট।

ব্যাগ খুলে তুখানা উত্তরপাড়ার টিকিট বার করে দিল মিণ্টু।

সন্ধ্যের মধ্যেই ফিরে আসব। বনমালীর মাকে বলে এসেছি যেন চলে না যায়। আমরা যতক্ষণ না আসি—

মিণ্টু বাপের কান বাঁচিয়ে বলে ওঠে, পাহারা রেখে যাচ্ছ ? পাছে আমিই চলে যাই।

ওমা। কথার কী ছিরি মেয়ের। রান্নাবান্নার দিকে যাসনি। মাছ তরকারি রেঁধে রেখে এসেছি। ফিরে এসে ভাতটা করে নেব।

মা। আরও কিছু বলার আছে তোমার ?

আবার কী বলার থাকবে ?

তাহলে আমি বাড়ি চললাম। এইমাত্তর একটা গাড়ি ছেড়ে গেছে। এবার হয়তো একটু দেরি হবে।

· তরতরিয়ে বাড়িমুখো রাস্তায় হাঁটতে লাগল মিণ্টু। কিন্তু মিণ্টু কি অরুণের কাছে সবটাই বানিয়ে বলেছিল? মিণ্টুর মধ্যে কি একটা অসম্ভবের আশা উত্তাল করছিল না মিণ্টুকে?

মিণ্টুর বাবা রিকশা ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে সরে এসে বললেন, কী এত কথা হচ্ছিল মায়ে মেয়েয়?

কী আবার। এই কোথায় কী রেখে এসেছি। রাত্তিরে না রাঁধতে যায়।···

বলেই তারপর হঠাৎ বলে ওঠে, হ্যাঁ গো শুনেছ অরুণ আর এখানে থাকছে না। কলকাতায় মেসে থাকবে।

থাকলেই মঙ্গল। তোমায় কে বলল?

বনমালীর মা। ও লাবুর বাড়ি গরুর কাজ করে। মেয়ে তো সেই অবধি ঢালে খাঁড়ায়।

সব ঠিক হয়ে যাবে। যা ঘরবর যোগাড় করেছি।

সেদিন তোমার অরুণকে অতটা হ্যানস্থা ভাবে কথাটা বলা বোধহয় ঠিক হয়নি।

বেঠিক আবার কী। ঠিকই বলেছি। চিরকাল ঘরের ছেলে বলে জেনে আসছি। ভাইবোনের মতো দেখে তাই জানি। হঠাৎ মাকে ঘট্‌কী লাগিয়ে বলতে পাঠানো হলো মিণ্টুর সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে। শুনে মাথার রক্ত চড়াৎ করে উঠবে না?

'মায়ের' মতো বেহায়া জাত আর দুটি নেই। একেই বলে 'জাত বেহায়া'। তা না হলে লাবু এতদিন পরে ছেলের হঠাৎ এখন ডেলি প্যাসেঞ্জারীতে অসুবিধে হচ্ছে বলে কলকাতায় মেসে থাকবার সংকল্প ঘোষণায় হাহাকার না করে সাবধানে বলল, তো সেই গোড়ায় তখন তো প্রবাসদা কত আগ্রহ করেছিলেন। তুই মাকে একা রাখব না ছুতোয় থাকলি না। এখন তো গিয়ে থাকতে পারিস। কত খুশী হবেন। ভালো মেসই বা চট করে পাচ্ছিস কোথায়?

অরুণ কি মায়ের ওপর এত বেশী নিষ্ঠুর হতে পেরেছিল? বলে

উঠতে পেরেছিল, আগ্রহটা আমার বানানো কথা মা। আর যাই হোক তোমার প্রবাসদা সেই আগের অবস্থায় নেই।

নাঃ। মায়ের ওপর অনেকখানি নিষ্ঠুরতা করেছে অরুণ। আর করতে পারল না। বলল, না বাবা। ওসব বড়লোকের বাড়িটাড়ি আমার পোষাবে না।

লাবু একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

বলছিস তো এখনো মেস যোগাড় হয়নি, বন্ধুর মেসএ গিয়ে উঠবি। এমন বন্ধুই বা তোর কে আছে?

আঃ। সে কি আমায় বিনা পয়সায় থাকতে দেবে? না আমি তাই থাকব? হয়েছে সে সব কথাবার্তা।

আর কী বলবে লাবু?

আর কী বলার থাকে স্বপ্ন ভেঙে যাওয়া মানুষের?

মোটামুটি কিছু দরকারি জিনিসপত্র একটা সুটকেসে ভরে নিয়ে রওনা দিয়েছিল অরুণ। মায়ের জন্যেই মনটা ভারাক্রান্ত হয়েছিল। কে ভেবেছিল রেলগাড়িতে ওঠার পর সেই ম্লানকুণ্ঠিত বেচারী মূর্তিটি চোখের সামনে থেকে মুছে গিয়ে প্রখর আগুনের মতো জ্বলতে থাকবে একটি নতুন মূর্তি।

সারাক্ষণ সারামন আচ্ছন্ন হয়ে থাকে সেই তীক্ষ্ণ শ্লেষ আর বিদ্রূপে ভরা কথা। তীব্র দৃষ্টি।

কী আশ্চর্য! এমন অসমসাহসিক কাজটা করতে এসেছিল মিণ্টু কী করে?

কিন্তু মিণ্টু কি তার কথা রাখবে? ভয়ানক একটা কিছু করে বসবে না? যদি অরুণ পরে শুনতে পায় ওইদিন ওইসময় মিণ্টু রেললাইনের তলায়—

অরুণ কি পরের স্টেশনেই নেমে যাবে? উল্টোমুখো কোনো একটা ট্রেনে চেপে বসবে?

লাভ হবে কিছু?

কিন্তু মিণ্টু বলেছে, 'আমি অতো বোকা নই অরুণদা। জীবন

জিনিসটা এত সস্তা নয়।' বলেছে, আমি দেখতে চাই তুমি বড়লোক হয়েছ। ওই অহঙ্কারী কর্তা-গিন্নীর মুখের মতো জবাব দিয়েছ।

অরুণ ট্রেনের দিকে এগোতে এগোতে বলেছিল, তাতে তোমার কী লাভ?

মিণ্টু বলেছিল 'সব লাভ' কি চোখে দেখা যায় অরুণদা? তবু তো মনে করতে পারব একটা ইট পাথরকে মনপ্রাণ দিয়ে বসিনি।

এই প্রথম এমন স্পষ্ট আর অনায়াস আত্মপ্রকাশ মিণ্টুর।

সত্যিই আমি একটা কাপুরুষ।

সত্যিই একটা ইটপাথর।

*   *   *

ছেলের আস্তানার খোঁজ পেয়েছিল উদয়ের মা অনেক দিন আগেই। কিন্তু ধরতে পারছিল না। কখন যে কোথায় কী কাজ করতে চলে যায়। 'ভবেশভবনে' এমন তো কেউ থাকে না যে হদিসটা দিয়ে দেবে।

হঠাৎই একদিন পেয়ে গেল।

একটা ভারা বাঁধা বাড়ির সামনে লরী থেকে ইট নামাচ্ছে আর দুটো জোয়ান লোকের সঙ্গে।

ছুটে এল উদয়ের মা।

বলল, এই কাজ করতেচিস তুই উদয়?

মায়ের বুক মোচড় দেওয়া আর্তনাদের মতো প্রশ্নে উদয়ের মধ্যেও একটা মোচড় খেল। তবু উদয় মাথার বোঝা লরী থেকে ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে থাকা লোকটার হাতে ভার লাঘব করে বলে উঠল, ক্যানো? কাজটা কী মন্দ?

এই বয়েসে এই কাজ? সেই আতাবাগানের ইসে এসে দিদিমণি কী বলতো।

দিদিমণির কতা তুলে থোও।

মা বলল, আর কতক্ষণ এমন খাটতে হবে?

এই যতোক্ষণ না ইঁট গুলান লরীতে উটচে। এই তো হয়ে এয়েছে পেরায়।

আমি উই গাচতলাটায় গে দাঁড়াচ্চি উদয়। তুই কাজ সেরে চটাপট চলে আয়।

মাকে দেখে উদয়ের প্রাণের মধ্যে তোলপাড় করছে, তবু উদয় ভাঙে তো মচকায় না। তাছাড়া—মনে হচ্ছে যেন গাছতলার ওখানটায় কেষ্ট কাকা দাঁড়িয়ে।

উদয় তাচ্ছিল্যের গলায় বলল, ক্যানো? আমারে নিয়ে তোমার কী কাজ?

'মা' বলে মনটা একটুক কাঁদে না তোর উদয়?

কাঁদলেই বা কী করচি?

এই সময় লরীর লোকটা খিঁচিয়ে উঠল।

উদয় বলল, তুমি অ্যাখোন যাও তো।

নির্মলা সরে গেল।

কিন্তু সরে যাবে না সে। ছেলেকে নিয়ে যাবে।

কিন্তু যাবে কে?

উদয় বলল, আমার কোনো কষ্ট নাই। বেশ আচি।

তোকে ছেড়ে আমার খুব কষ্ট উদয়। চল বাবা, আমার সঙ্গে। কেমন ভাল ঘর। সোংসারে অভাব কিছু নাই।

উদয় অগ্রাহ্যের গলায় বলল, সোংসারটা তোর?

নির্মলার মুখটা কেমন যেন হয়ে গেল।

কেষ্ট এগিয়ে এল এখন হাতের বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে।

আমিও তো তোর পর নয় বাবা। আপন জন। একটা ছেলে পোষার মতন অবস্থা আচে। তোর মা ছেলে ছেলে করে হেদিয়ে মরে।

নাঃ। আমি বেশ আচি।

নির্মলা প্রায় ডুকরে ওঠে, এই তোর বেশ থাকা! তোর কেষ্ট কাকা তোরে ভালবাসে। কত খোঁজাখুঁজি করে—

কেষ্টও বলল, চল না বাপ। সুখে থাকবি।

সুক আমার সয় না!

বুলিটা তোর তরে কেবল 'দাদা দাদা' করে। চল না বাবা। সবাই মিলে একত্তরে থাকি।

উদয় একবার মায়ের মুখের দিকে তাকায়। তারপর কেষ্ট কাকার দিকে। লোকটা খারাপ নয়। ভেতরে মায়া মমতা আছে।

তবু উদয় মাথা নাড়ে।

নাঃ। বেশ স্বাদীন জেবনে আচি।

কেষ্ট বলল, ওখানেও স্বাধীন জেবনেই থাকবি বাবা। কেউ তোরে কিছু বলবে না।

খেটে খেতে দেবে?

নির্মলা চমকে ওঠে।

শোনো কতা। যার জন্যে এতো, তাই করতে চাস? তুই এই—এখন তো আমার কোনো অভাব নাই বাবা। নিজে পাঁচ বাড়ি কাজ করি, আর তোদের কেষ্ট কাকা তো জানিসই। ডাকঘরের চাকরী। এখন আরো মাইনে বেড়েছে।

উদয় বুনো ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকিয়ে বলে, সে তোমাদের ব্যাপার। আমি স্বাদীন থাকতে চাই।

কেষ্ট তাড়াতাড়ি মধ্যস্থতার গলায় বলে, আচ্ছা বাবা, তাই করিস। ইট বওয়া ভিন্নোও জগতে আরো কাজ আছে। ঘরে থাকবি, মায়ের হাতের রান্না খাবি। তোর মা ভালমন্দ রান্নাটি হলেই বলে, উদয় এটা ভালবাসে।

উদয় হঠাৎ জেদি আর সন্দেহের গলায় বলে ওঠে, কই, আগে তো কখনো মায়ের শরীরে এতো স্নেহ দেখি নাই। এখন হঠাৎ—

নির্মলা কেঁদে ফেলে।

আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বলে, ত্যাখন কী আর আমি আমাতে ছিলুম মানিক! তোদের লক্ষীছাড়া বাপটার রাতদিন খিঁচুনি আর ঠ্যাঙানির দাপট তা'হককে আবার নেশা করবে বলে আমার

রোজগারের পয়সাগুলান হাত মুচড়ে কেড়ে নেচে। সবদিন ভাতই জোটেনি তো সেনো প্রকাশ করবো কখোন? চল বাবা আমার সাতে।

উদয় বলল, অ্যাখোন কী করে যাবো? কাজ ফেলে?

এই তো বললি, কাজ সমাধা হয়ে গ্যাচে।

মজুরিটা নিতে হবে না?

কেষ্ট বলল, হাতে হাতে দেয়?

না দিলে কে ঠিকে কাজ করতে আসবে?

তো তা ভাল। তোর মা ঘর যাক, আমি এখেনে দাঁড়িয়ে থাকি, তোরে সঙ্গে করে নে যাব।

তুমি বুজিয়ে দাও না বাসাটা কোতায়। আমি নিজেই চলে যাব।

সে তুই বুঝবি না। রেললাইনের ওপারে। আমি আচি।

উদয় হঠাৎ ভরু কুঁচকে বলে, আমারে নিয়ে এতো পেড়াপিড়ি! তোমাদের মতলবখানা কি বলো তো?

কেষ্ট একটু থতমত খেয়ে বলে, মতলব আর কি। তোর মা কাঁদে কাটে।

আচ্ছা চল, যাচ্ছি।

কই, মজুরি নিলি না?

আমার হয়ে আমার বন্ধুটা নিয়ে রাকবে।

দৈনিক কত দ্যায়?

ঠিক নাই। যেদিন যেমন। একশো ইঁট পিছু দাম ধরে।

নির্মলা বলল, কাজটা খুব কষ্টের উদয়।

বলি কোন কাজটা কষ্টের না? তুমি যে পাঁচ ঘর বাস্নুন মেজে বেড়াও। সেটা খুব আরামের?

বাসাটা ভাল।

খোলা-মেলা। বুলি আর কেষ্ট কাকার সঙ্গে দাওয়ায় বসে,

মোটা গোটা চালের ভাত শোল মাছের ঝোল পুঁইশাক চচ্চড়ি আর আমড়ার টক দিয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে খেয়ে, উদয় বলে, বাপটা এখেনে এসে ঝামেলা করে না ?

ইয়ে না তো!

নির্মলা আর কেষ্ট একবার তাকাতাকি করে।

কিন্তু ততক্ষণে বুলি বলে ওয়ায়, বাবা আর আতাবাগানে আচে নাকি ? তাড়ির দোকানের কর্তার মাতা ফাইটে দে, এখোন তো জেল খাটতেচে বাবা।

অ্যাঁ! কই অ্যাতোক্ষণ বলো নাই ?

নির্মলা ম্রিয়মাণ গলায় বলে, কী আর সুখবর, তাই আগ বাড়িয়ে বলতে যাব!

উদয় হঠাৎ হি হি করে হেসে উঠে বলে, তালে উদয়ের অ্যাখোন পিথিমীতে পরিচয় জেলখাটার ব্যাটা। বলি, 'ভাল' হবার দায়টা কী উদয়ের ? অ্যাঁ ? যাক গে।

নির্মলা বলল, ওমা, পেটে ভাত কটা দিয়েই চললি কোতা ?

যেতায় থাকি।

নির্মলার মুখটা সাদা হয়ে যায়।

থাকবিনে ?

না না! খেতে বললে, খেয়ে গেলুম। বাঁদাবাঁদির মদ্যে উদয় নাই।

বুলি ছুটে এল রাস্তা পর্যন্ত, আর আসবিনে দাদা ?

নাঃ!

হেই দাদা! থাক না।

উদয় একটু দাঁড়াল।

তার বছর সাতেক বোনটার দিকে একটু তাকাল। তারপর বলল, থাকবো ক্যানো ? এটা কী আমাদের বাপের ঘর ? ব্যাটাছেলে এমন ঘরে থাকে না।

চলে গেল হনহনিয়ে।

কাজে আর জোয়ার নেই।

প্রত্যেকেই ক্রমেই ব্যক্তিগত জীবনের দায়ে জড়িয়ে পড়ছে।

হয়তো ভবেশ ভৌমিক নামের লোকটা বেঁচে থাকলে এমনটা হতো না। একটা 'আদর্শ' ততক্ষণই বেশী জোরালো থাকে, যতক্ষণ সেই আদর্শের জনক সামনে উপস্থিত থাকেন। সেই উজ্জ্বল উপস্থিতিই অপরকে প্রেরণা যোগায়।

এখন ভবেশ ভবনের নিত্য হাজরেদার শুধু সুকুমার।

সে আসে। ধূপ জালে। ভবেশদার কাছে কিছু বাক্য পেশ করে। তার চৌকির ওপর উপুড় হয়ে পড়ে লিখতে শুরু করে।

কি লেখে?

সেকথা সুকুমারই জানে।

উদয় মাঝে মাঝে অবসর পেলে দরজায় এসে বসে। বলে, কী অ্যাত্তো নেকো গো দাদাবাবু?

ও তুই বুঝবি না।

বুজিয়ে দিলে বুজতে পারি।

পৃথিবীতে হঠাৎ কোনোদিন এমন মানুষের আবির্ভাব হবে যে—

কি 'ভাব' হবে?

ওঃ। ভাব নয়। মানে এমন কেউ জন্মাবেন যে, তাঁর বুদ্ধিতে পৃথিবীতে আর দুঃখ কষ্ট থাকবে না। সব মানুষ সুখী হবে।

উদয় বলল, 'অবতার'-এর কথা কইচো?

অবতার? তুই জানিস কাকে বলে অবতার?

ওই শুনি আর কী! রামচন্দ্র অবতার ছিল। দশবার দশ অবতারে জন্মেছেল।

তা ধর, তেমনি কেউ জন্মালো—

জন্মালো, তো কী?

'কী' কি রে? তিনি এসে সব মানুষকে বোঝাবেন, রাতদিন এতো মারামারি কাটাকাটি হিংসে লড়াই, এসব আর নয়। সব

মানুষ সমান। কেউ খেতে পাবে না, আর কেউ টাকার গদিতে শোবে, এও ঠিক নয়। পৃথিবীর সবাই মিলেমিশে ভালবেসে থাকুক, দেখবে কত শান্তি।

উদয় একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলে, সবাই শুনবে তার কতা ?

শুনবে, শুনবে।

সুকুমার উঠে বসে। যেন সামনে শত শত শ্রোতা, এইভাবে বলে, তিনি যে পৃথিবীটা পাল্টে দিতেই আসবেন।

উদয় আরো অবজ্ঞার গলায় বলে উঠল, শুনতে নোকের দায় পড়েছে। বলে, ভগমানই হার মেনে গেল, দশ দশবার শুদ্ধু এলো গেলো, আর তুচ্ছু একটা মানুষ পিথিমীটাকে পাল্টে দেবে ?

দেখ, 'মানুষ' তুচ্ছ নয়। সে যদি মানুষের মতন মানুষ হয় ভগবানের থেকেও উঁচু হতে পারে—

'যদি'। হুঁঃ।

বোধবুদ্ধিহীন এবং নিজের ওজন সম্পর্কে জ্ঞানহীন ছেলেটা অনায়াসে সুকুমারকে নস্যাৎ করে দিয়ে বলে, যদির কতা নদীতে যাক। তোমার যেমন খেয়েদেয়ে কাজ নাই তাই বসে বসে এই সব আবোল-তাবোল নিকে সারা হচ্চো। জগৎ সুদ্দু নোক একজনার কতায় রাতারাতি 'ভালছেলে' হয়ে যাবে। হেঁঃ !

উঠে পড়ে দরজা ছেড়ে এগিয়ে যায় বলতে বলতে, পাগোল আর কারে কয় !

সুকুমার ওই ছেলেটার নস্যাৎ ভঙ্গির দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার শুয়ে পড়ে। এখন আর উপুড় হয়ে খাতা কলমের ওপর নয়। চিৎ হয়ে, চোখে হাত চাপা দিয়ে।

এই বেয়াদব ছেলেটাকে না পারা যায় বে-আদবির জন্যে শাসন করতে, না পারা যায় আদব সমীহ শেখাতে।

বলতে গেলেই হয়তো বলে বসবে 'এই রইল তোমার ঘর দুয়ার। উদয়ের ফুটপাথ আছে।'

কত দিনের যেন পর হঠাৎ দেখা হয়ে গেল একটা স্টেশনারি দোকানের মধ্যে।

সৌম্য ইশারায় বলল, চলে যেও না। কথা আছে।

রাস্তায় নেমে বলল, তোমার যে আর দেখাই পাওয়া যায় না। কী হলো ?

কত কী হতে পারে। এই শোনো, আমায় কলকাতার বাইরে একটা মাস্টারি যোগাড় করে দিতে পারো ?

সৌম্য একবার ওর দিকে তাকিয়ে আস্তে বলল, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে একটু সময় লাগবে। চলো, কোথাও গিয়ে বসা যাক।

ব্রততী বলল, 'কোথাও' মানে তো কোনো একটা রেস্তোরাঁয় ? 'দু কাপ চা আর দুটো ডবল ডিমের মামলেট !'

সৌম্য হতাশ গলায় বলল, উপায় কী ? এই বৃহৎ পৃথিবীতে মানুষের বসবার মতো একটু জায়গা কোথায় ? তবু ওরা হৃদয় দ্বার খুলে রাখে, তাই—

শুধু দু পেয়ালা চা নিয়ে বসতে চাইলে কতক্ষণ বসতে দেবে ? নিরিবিলিই কি দেবে ?

অতএব কিছু খাদ্যবস্তুর অর্ডার দিতে হয়। একটু নিভৃতির প্রার্থনা করতে হয়।

চায়ের কাপটা হাতে তুলে, মুখে না তুলে সৌম্য বলে, কী ব্যাপার ? হঠাৎ কলকাতার বাইরে কাজের দরকার হলো যে ?

কলকাতায় থাকলেই তো বাড়িতে থাকতে হবে। আর পারা যাচ্ছে না।

ব্রততীর মানসিক অসুবিধের বিষয় একেবারে অনবহিত নয়। ছোট ছোট কথা, ছোট্ট ছোট্ট মন্তব্যে ধরা পড়ে যায় অনেক কিছু। অবশ্যই যেখানে বলে ফেলার মধ্যে থাকে অন্তরঙ্গ আশ্বাস, আর শোনার মধ্যে থাকে গভীর অনুভূতি। এই দুটোর যোগফলে সৌম্য জানে, ব্রততী নিজেই একটি সমস্যা। সে তার নিজের মায়ের মানসিকতার সঙ্গে কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারছে না।

তবু সৌম্য একটু গভীর হলো। বলল, কলকাতাকে ত্যাগ করার ডিসিশানটা এত সহজে নেওয়া হতে পারল ?

ব্রততী চশমাটা চোখ থেকে একবার খুলে আবার চোখে বসাল। তারপর আস্তে বলল, তোমার কি মনে হচ্ছে, খুব সহজে ?

সৌম্য একটু যেন চমকে উঠল।

ঠিক এই কথাটা ঠিক এই ভাবে কে যেন কখন বলেছিল সৌম্যর কাছে।

ওঃ। মনে পড়ে গেল।

বাবা।

সেই প্রথম দিন প্রবাসজীবন বলেছিলেন, 'তোমার কী মনে হচ্ছে, খুব সহজে ?'

তারপরই অবশ্য প্রবাসজীবন নিজের নিঃসঙ্গতার দুঃখ নিয়েই বেশী করে বলেছিলেন। হয়তো আগের ওই প্রশ্নটাকে মোলায়েম করতে।

এখন ব্রততীও তাই করল।

কথাটা বলার পর একটু থেমে বলল, বাড়িতে আমার অবস্থা কী জানো আমি যেন ভীষণ ভি. আই. পি. এক কুটুম্ব। আমার সেবা-যত্ন সম্মান সমীহর শেষ নেই। আমি বাড়ি ঢুকলাম কী, সবাই তটস্থ। এমন কী সেই কাকা পর্যন্ত। মার কথা তো ছেড়েই দাও। এ অবস্থা সহ্য করা যায় ?

সৌম্য একটু হাসল, বোধহয় নয়। কিন্তু কারণটা কী ?

জানি না। সেটাই দুর্বোধ্য। তবে ? বল ? দিনের পর দিন এভাবে কাটানো যায় ? অথচ--কলকাতার মধ্যে থেকে তো আর অন্যত্র থাকা সম্ভব নয়। দূরে কোথাও চলে যেতে পারলে—আমি তোমায় সিরিয়াসলিই বলছি সৌম্য।

সৌম্য আবার একটু হাসল।

বলল, আমার অবস্থাটি মন্দ নয়। এদিকে তুমি বলছ, 'বাড়ি অসহ্য', বাইরে একটা চাকরিটাকরি জুটিয়ে দাও, ওদিকে

প্রবাসজীবন সেন বলছেন, 'বাড়ি অসহ্য' একখানা 'ওল্ডহোম'-এ চালান করে দাও।

প্রবাসজীবন।

ব্রততী প্রায় ছিটকে উঠে বলল, কি? কি বলেছেন তোমার বাবা?

ওই তো বললাম। একটি ওল্ডহোম-এর প্রার্থনা।

সৌম্য!

বল।

এমন অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে কেন?

'কেন' হয়তো অনেক। তবে ওঁর বক্তব্য হচ্ছে নিঃসঙ্গতা। সেখানে অনেক বুড়ো পাবেন। কথা কয়ে বাঁচবেন।

সৌম্য! আমার মনে হয়, তুমিই তোমার বাবাকে বেশী নেগলেক্ট কর। কেন তিনি এতোটা লোনলি ফীল করেন?

আমি কি করব বল? আমি একটা বাউণ্ডুলে লক্ষ্মীছাড়া, আমার দ্বারা আর কতটা কী হবে?

ব্রততীর মুখে সামান্য একটু কৌতুকের হাসি ফুটে উঠল।

বলল, এ অবস্থায় তোমার উচিত হচ্ছে 'লক্ষ্মীযুক্ত' হয়ে পড়া। তাতে সমস্যার সমাধান হতে পারে।

সৌম্য চকিত আগ্রহে ব্রততীর দিকে তাকাল। তারপর হাত বাড়িয়ে ব্রততীর টেবিলে পড়ে থাকা বাম হাতটার ওপর একটা হাত রেখে গাঢ় স্বরে বলল, ঠিক ওই কথাটাই এক্ষুণি ভাবছি, ব্রততী।

হাতের ওপর একটু চাপ দিল।

বলল, এই একটা সিদ্ধান্তেই হয়তো দুটো প্রবলেমই সল্‌ভ হয়ে যায়।

ব্রততী হাতটা একটু সরিয়ে নেবার চেষ্টা করল। ব্রততীর মুখে আর একটু সূক্ষ্ম কৌতুকের হাসি ফুটে উঠল।

শুধু এই জন্যে?

সৌম্য ওর হাতটাকে ছাড়িয়ে নিতে দিল না। আর একটু নিবিড় ভাবে চেপে গভীর গলায় বলল, হয়তো এটা বলতে পাওয়ার একটা আকস্মিক সুযোগ জুটে যাওয়া। যদি বিশ্বাস করতে পারো তো বলছি—শুধু এইজন্যেই নয়।

কিন্তু এইমাত্র বললে, ঠিক এখনই ভাবলে।

বললাম।

সৌম্য ওর চোখে চোখ রেখে বলল, তুমি তো জানো, খুব গুছিয়ে কথা বলা আমার আসে না। যখনি বলতে ইচ্ছে হয়, ঠিকমতো পরিস্থিতি খুঁজে পাই না। তাই কথাও খুঁজে পাই না।

ব্রততী বলল, তার মানে, আমরাও গৌতমদের মতো—

সৌম্য বলল, কী এসে যায়? আমরাও তো মানুষ। সাধারণ মানুষই।

তা হোক। এত তাড়াতাড়ি এ ডিসিশান নেওয়া যায় না।

কার পক্ষে? আমার পক্ষে, না তোমার পক্ষে? যদি তোমার হয়, তাহলে অবশ্য জোর করার কথা ওঠে না। তবে আমার বিষয়ে বলা যায়, এটা 'তাড়াতাড়ি' নয়। এ শুধু সাহসের অভাবে পিছিয়ে থেকে সময় নষ্ট করার পরের অবস্থা।

তুমি কোনদিন ভেবেছ, ঘর বাঁধবে সংসার করবে?

অত ডিটেলস কিছু ভেবেছি কিনা জানি না, তবে তোমাকে ছাড়া যাবে না এটা নিশ্চিত ছিল। সময়ের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে রেখেছি। হঠাৎ তুমি যেই কলকাতা ছাড়ার কথা বললে—

সৌম্য একটু হাসল।

বলল, হয় না, না?

ব্রততী বলল, বোধহয় একটু ভাবতে হবে।

সৌম্য নিজের হাতটা ওর হাতের ওপর থেকে তুলে নিল। আস্তে বলল, আচ্ছা ভাবো।

নিঃশব্দে দুজনে খাবারের প্লেটটা টেনে নিল।

আহারান্তে বিল মেটালে সৌম্য।

নিজের হাতে তুলে নেওয়া মৌরী থেকে একটুখানি মৌরী ব্রততীর হাতে দিয়ে বেরিয়ে এসে রাস্তায় পড়ল।

সৌম্য বলল, একটা ট্যাক্সী নেব ?

নিয়ে কী হবে ? দুজনে তো দুমুখো !

তা বটে !

আর ঠিক সেই মুহূর্তে ব্রততী নিচু গলায় বলে উঠল, ভেবে দেখলাম, পথটা একমুখো হওয়াই সঙ্গত !

ঠিক বলছ ?

বলছি।

তবে এসো, একটা ট্যাক্সী নিয়ে খানিকটা একসঙ্গে—

নিল একটা ট্যাক্সী।

ব্রততী উঠে বসে বলল, ভাবলাম—কলকাতায় থেকেও বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র থাকার এটাই একটা সহজ আর আইনসঙ্গত উপায়।

সৌম্য একটু হেসে বলল, শুধু এইজন্যে ?

ওঃ। খুব একহাত নেওয়া হলো !

ব্রততী !

বল।

আমরা এতগুলো দিন নষ্ট করেছি কেন ?

কে বলল, নষ্ট করেছি ? এই দিনগুলোই তো আমাদের সঞ্চয়।

আহ্লাদে দিশেহারা হন প্রবাসজীবন। তাঁর ভাব দেখে মনে হচ্ছে যেন এটাই তাঁর জীবনের চরম সার্থকতা। আর, এরপর আর কোন সমস্যা থাকবে না তাঁর, থাকবে না কোন দুঃখ।

এ এক আশ্চর্য হৃদয় রহস্য !

এখন প্রবাসজীবন মান খুইয়ে বারবার দিব্যকে আর চৈতালীকে ডেকে ডেকে বলছেন, প্রবাসজীবনের ছোট ছেলের বিয়ের ব্যবস্থাপনাটি কেমন হবে।

বারবার সৌম্যকে ডেকে ডেকে বলছেন—জীবনে বড় হতাশা এসে গিয়েছিল বাবা। তুই আমায় বাঁচালি।

সৌম্য হেসে বলে, অত আশান্বিত হয়ো না বাবা। বলে তো রেখেছি, সাঁড়াশি আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত থেকো।

সে ভয় করি না।

বলেন প্রবাসজীবন, তুই যে মেয়েকে এতদিন দেখে বুঝে ভালবেসে—

সৌম্য হেসে ওঠে, তাতে কোন ভরসা রেখো না। জানো তো, এই বেড়ালই বনে গেলে বনবেড়াল হয়।

মেয়েটিকে যেদিন সঙ্গে করে এনেছিলি, দেখেছি তো। দেখে খুব ভাল মেয়ে বলে মনে হয়েছে।

হলেই মঙ্গল।

* * *

চৈতালী বলে, ভীষ্মদেবের প্রতিজ্ঞা ভাঙল তাহলে?

সৌম্য বলল, এমন কোন অমোঘ প্রতিজ্ঞা করেছিলাম বলে তো মনে পড়ছে না।

মুখে না করো, দেখে শুনে তাই ধারণা হতো!

তাই নাকি? হা হা হা। মানুষ কত ভুল ধারণাই পোষণ করে। আমি তো ওই মেয়েটাকে যেদিন প্রথম দেখেছি, সেদিন থেকেই ওর প্রেমে পড়ে বসে আছি।

এই স্পষ্ট পরিষ্কার নির্লজ্জ উক্তির পর আর কথা বলতে রুচি হয় না চৈতালার। হয়তো বা সাহসও হয় না। মনে হচ্ছে, চৈতালীকে এরপর যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হতে হবে।

দিব্যর কাছে গিয়ে বলল, এরপর বোধহয় আমাদের এ বাড়ি থেকে বাস তুলতে হবে।

দিব্য শঙ্কিত হলো।

কেন? কে কী বলেছে?

বলেনি। তবে ছোটসাহেব যেন তলে তলে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

দিব্য জীবনে বোধহয় এই প্রথম চৈতালীর কথার প্রতিবাদ করে ওঠে। বলে, কি যে বল! তোমার যেন 'ভয়' ডেকে এনে ভাবনা করা! সৌম্যর মতন ছেলে হাজারে একটা পাবে না!

বদলাতে কতক্ষণ? পুরুষ জাতটাকে বিশ্বাস নেই!

দিব্য হঠাৎ একটা অলৌকিক মার্কা হাসি হাসে।

বলে, তা অবশ্য ঠিক।

এই হাসিটা দেখে চৈতালী আরো শঙ্কিত হয়। কিন্তু এখন তার গুরু এবং মন্ত্রী কঙ্কণাদির কাছে ছুটে যাবার উপায় নেই। সে তার নতুন বরের সঙ্গে ইউরোপ বেড়াতে গেছে।

চৈতালী যেন চোখের সামনে দেখতে পায়, এ সংসারে তার আধিপত্য, তার কর্তৃত্ব খর্ব হয়ে যাচ্ছে।

যে মেয়ে সৌম্যর মতো উদোমাদা ছেলেটাকে কব্জা করে ফেলতে পেরেছে, সে মেয়ে সোজা নয়!

তা চৈতালী যে মানসিকতায় ভুগুক, বাড়িতে উৎসবের হাওয়া লেগে যেতে ছাড়ে না। যদিও সৌম্য বলেছিল, নো ঘটাপটা নো অনুষ্ঠানের ঝকমারি। সোজা ম্যারেজ রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে—

কিন্তু সে কথা শুনছে কে?

দিব্যও যেন হঠাৎ চৈতালীর বিরোধী পক্ষে নাম লিখিয়ে বসেছে। যখন তখন বাপের কাছে গিয়ে আসন্ন উৎসবের আলোচনা করতে বসছে।

বাপ বললেন, দেবুটাকে একটা চিঠি দিলে ভাল হয় না দিব্য?

দিব্য হেসে বলল, সে কী আপনি না দিয়ে ছাড়বেন? দিয়ে দিন একখানা লম্বা পত্তর। দেবু, তুমি না আসিলে বিবাহ হইবে না।

প্রবাসজীবনের মনে হয়, মেয়েটা খুব পয়মন্ত। কতকাল পরে বাড়িতে একটা সহজ হাসির হাওয়া বইছে।

ওদিকে কাটুমকাটাম তো তাদের কাকাইয়ের বিয়ের খবরে হাওয়ায় ভাসছে।

বিয়েতে কি খাবে, কি পরবে, কি সাজে বরযাত্রী যাবে—

উত্তেজনা প্রবল।

একটা পাথরের মতো বাড়ি যেন হঠাৎ হালকা হয়ে উঠেছে শুধু একটি আসন্ন উৎসবের অপেক্ষায়।

এর মধ্যে আবার একদিন কাটুম মাকে প্রশ্ন করে বসল, মা, কাকী এলে তুমি তার সঙ্গে ঝগড়া করবে না তো?

ঝগড়া! আমি লোকের সঙ্গে ঝগড়া করে বেড়াই? চমৎকার!

না, মানে, হেসে হেসে কথা বলবে তো?

দেখো, বাজে বাজে প্রশ্ন করে আমার মাথা ধরিয়ে দিও না। যাও। নিজেদের কাজ করো গে।

অতঃপর দুই ভাইবোনে আড়ালে বাক্য বিনিময়।

মায়ের সম্পর্কে খুব একটা নিশ্চিন্ততা নেই তাদের।

শিশু 'সরল' শিশু 'অবোধ'—বড়দের এই ধারণাটির মতো ভুল ধারণা আর নেই।

শিশু হচ্ছে একটি ঝুনো এবং পরমজ্ঞানী জাত।

হ্যাঁ, খুব ভাল ঘটাপটা করেই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল মিণ্টুর। অবশ্য এ অঞ্চলে যাকে 'ঘটাপটা' বলে। আলোয় ঔজ্জ্বল্যের এবং মিষ্টান্নে মিষ্টত্বের কিছু ঘাটতি ঘটেনি। মিণ্টু সাধারণ মেয়েদের রীতি অনুযায়ীই কাঁদতে কাঁদতে বরের পিছু পিছু গাড়িতে গিয়ে উঠেছিল।

কান্নাটা এমন কিছু বাড়াবাড়ি নয় যে কারো বিশেষ নজরে আসবে।

অদৃষ্টের পরিহাস বরং লাবু নামের বেচারীটির। তাকে এ বিয়েতে আসতে হয়েছে, খাটতে হয়েছে, মঙ্গলকর্ম ব্যতীত আর সকল কর্মেই যোগ দিতে হয়েছে।

না দিলে, লোকে কি বলবে? ভিতরের যে এক দুঃখময় গ্লানির ইতিহাসটি সে তো আর কারো জানার নয়। অরুণ আসতে পারল না, ছুটি পেল না বলে।

মিণ্টুর মা বাবা চালক মানুষ, তাঁরা ভুলেও কারুর কাছে ফাঁস করে বসেননি লাবু একদা বামন হয়ে চাঁদ ধরতে হাত বাড়িয়েছিল। ওর ওই 'শুধু কেরানী' ছেলেয় বৌ করতে চেয়েছিল মিণ্টুকে।

মিণ্টুর যে একখানা বড় ঘরে বিয়ে হলো, একটা কেষ্টবিষ্টু বর হলো, সেটা যেন মিণ্টুর বাপেরই ক্যাপাসিটি। মিণ্টুর ভাগ্যের জোর নয়।

সম্বন্ধটা তো প্রায় আপনিই এসে গিয়েছিল।

আর সেই বরটি যে এমন উদার আর হৃদয়বান, সেও কী মিণ্টুর ভাগ্যের জোর নয়?

এখন অবশ্য মিণ্টুর মা দুঃখ করে, বিয়ে হতে হতেই যে অমন দূর দুরান্তে চলে যাবে মেয়েটা, আর বছর ঘুরে গেলো তবু একবার আসবে না, এমন ভাবিনি।···দিল্লী লক্ষ্ণৌ বম্বে পুনা হায়দ্রাবাদ রাজস্থান এ সব তো জানি, সাতজন্মে শুনিনি কারুর মেয়ে বিয়ে হয়ে 'কোরাপুট'-এ চলে যায়। কোথায় যে সেই কোরাপুট, তাই জানতুম না আগে।

তা মিণ্টুর মা ইতিপূর্বে না জানলেও মিণ্টুকে তদবধি ওই 'কোরাপুট' নামের জায়গাটায় থাকতে হয়েছে।

মস্ত কম্পাউণ্ডের ওপর ভাল কোয়ার্টার্স।

সরকারী কোন নতুন প্রকল্পের রসায়নবিদ মিণ্টুর বর কিংশুক।

ভারী উজ্জ্বল ছেলে।

মিণ্টু কী এই ঔজ্জ্বল্যের কাছে আত্মসমর্পণ না করে, নিজেকে চাবিবন্ধ করে রেখে দেবে? দিতে পারা যায়?

তবে বড় নির্জনতা। বড় নিঃসঙ্গতা।

নিঃসঙ্গতা তবুও সহনীয় হয়, যদি অন্ততঃ আশেপাশে চারিধারে জনবসতি থাকলে, জানলায় দাঁড়িয়ে পথচলতি লোকের আসা-যাওয়ার দৃশ্যে সংসারের একটা চলমান জীবনের স্বাদ মেলে!

কিন্তু মিণ্টুর ভাগ্যে নিঃসঙ্গতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নির্জনতা। অনেকখানি কম্পাউণ্ডের মধ্যে কোয়ার্টার্স। একটা বাঙালীর মুখ দেখতে পাওয়া তো দূরস্থান, একটা মানুষের মুখই দেখা যায় না।

যে সব কাজের লোক আছে, বাসনমাজনি বুড়ি 'আপ্পামা', রান্নাবান্না আর ঘরের কাজের জন্য 'বেঙ্কটেশ্বর', বাগান পরিচর্যার মালী 'তিম্মা' এদের কারোর কোন কথাই বুঝতে পারে না মিণ্টু। তবে রান্নাটা সে নিজের হাতে রেখেছে।

কিংশুক বলেছিল, ওকে একটু শিখিয়েটিখিয়ে দিলে—

মিণ্টু গম্ভীর ভাবে বলেছিল, কোন্ ভাষায় শিক্ষার ক্লাসটি খোলা হবে?

আর সেই সূত্রেই একদিন দিব্যি খোলা গলায় বলে উঠেছিল, ভীষণ দামী একখানা 'বর' জুটে আমার অবস্থাখানি হয়েছে নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত একটি বন্দী! উঃ। এর থেকে আমার সেই 'শুধু কেরানী' 'পাড়ার ছেলেটাই' দেখছি ছিল ভাল। গেরস্তের মেয়ে গেরস্ত হয়েই থাকতুম। বাংলা কথা বলে বাঁচতুম।

কিংশুক চোখ কপালে তুলে বলেছিল, অ্যাঁ! এর মধ্যে আবার 'পাড়ার ছেলের' ঘটনাও ছিল না কী?

মিণ্টু অবলীলায় বলেছিল, থাকবে না কেন? ছিলই তো। জন্মাবধি দেখাশুনো ভাব ভালবাসা, অতি সজ্জন ছেলে, দোষের মধ্যে কেওকেটা কিছু নয়, নেহাৎই শুধু কেরানী! সেই দোষে বাবা তাকে 'যা ভাগ' বলে ভাগিয়ে দিল গো। দেবে না? হাতে যে তখন তোমা হেন নিধি!

কিংশুক বলেছিল, ঘটনা সত্যি?

সন্দেহের কী আছে? এমন ঘটনা সংসারে ঘটে না?

তার মানে, তোমার মধ্যে হতাশ বাল্যপ্রেমের জ্বালা?

সে আর নতুন কী? চিরকালই তো সকলের জানা, বাল্যপ্রেমে অভিশাপ আছে।

মিণ্টু।

বলুন সাহেব!

কথাটা শুনে নিজেকে খুব অপরাধী মনে হচ্ছে।

সেরেছে। তাহলে তো বলে ফেলাটা খুব ভুল হয়ে গেছে। শুধু শুধু বিনা দোষে অপরাধী!

আসলে মিণ্টু চেয়েছিল কিংশুকের কাছে কিছু গোপনীয়তা রাখবে না। জীবনটা যখন এই ছাঁচেই ঢালাই হয়ে গেল, একটা গোঁজামিল দিয়ে সে জীবন চালিয়ে যাবে না।

কিন্তু একদম প্রথমদিকে ভেবে পাচ্ছিল না ঠিক কী ভাবে বক্তব্যটা পেশ করা যায়। ভাবতে ভাবতে ওই আশ্চর্য উদার সহজ সুন্দর মানুষটাকে কেমন গভীর ভাবে ভালবেসেও ফেলল। সেই ভালবাসার শক্তিতে এমন নির্ভীক দুঃসাহস।

কিংশুক বলল, মনের মধ্যে এতটা কষ্ট চেপে রেখে সহজ হয়ে থাকতে তোমার খুব কষ্ট হয় তো?

ওসব গোলমেলে ব্যাপার নিজেই বুঝি না, তা বুঝাব কী অন্যে! তবে সত্যি বলতে তুমি লোকটা খুব রাগী গোঁয়ারগোবিন্দ বৌ-ঠ্যাঙানো টাইপের হলে, আমার একটু সুবিধে হতো। সেটা না হয়েই হয়েছে মুস্কিল।

অ্যাঁ। আমি একটা বদ বিশ্রী লোক হলে তোমার সুবিধে হতো?

হাণ্ড্রেড পার্সেণ্ট!

তারপর খুব নরম গলায় বলেছিল, আসলে বেচারীকে আমার মা বাবা শুধু গরীব বলে এতটা অপমান করেছিলেন। সেটাই খুব কষ্টের হয়ে আছে। পুরুষের পক্ষে অপমান জিনিসটা যে কত যন্ত্রণার—

কিংশুক ওকে একটু কাছে টেনে আস্তে বলল, আমার ওপর তোমার খুব রাগ হয় তো?

বাঃ বেশ! তো তোমার ওপর? বরং বলো তোমার পূজনীয় শ্বশুর-শাশুড়ীর ওপর।

ওঁরা ওরকম করলেন তুমি প্রতিবাদ করলে না?

মিণ্টু একটু গভীর ভাবে তাকিয়ে বলেছিল, অন্যপক্ষের মধ্যেও তো তার সমর্থন থাকা চাই? সে যদি হাল ছেড়ে দিয়ে ভাবে 'আমি তুচ্ছ' আমি কিছু না! আমি বামন, চাঁদে হাত বাড়ানো মুখ্যুমি তাহলে' কিংশুক দেখেছিল, মিণ্টুর চোখের কানায়

কানায় জল। আর কিছু বলেনি। একটু পরে বলে উঠেছিল, সামনের সোমবারে আবার অফিসে এক ঝামেলা আছে।

অন্যদিন হলে হয়তো মিণ্টু ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠতো, অফিসে তো তোমার রোজই ঝামেলা।

আজ শুধু চোখের কানায় ভরে আসা জলটাকে চোখের মধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার তালে অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, কি ঝামেলা?

আরে জার্মানী থেকে এক নামী কেমিস্ট আসছেন আমাদের এখানের ল্যাবরেটরির— ইয়ে সুখ দুঃখু ভাল মন্দ দেখতে। আমরা তো সবাই 'অজ' মুখ্যু!

কিংশুকের কথার ভঙ্গিই এই রকম।

এখন মিণ্টু কথা বলল, অথচ এখান থেকেও যত ভাল ভাল কৃতী ছেলেরা লোপাট হয়ে যাচ্ছে বিদেশে, 'কাজ' করতে।

সেই তো!

বলেই কিংশুক হেসে উঠল, কবির উপদেশ 'দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে—'

সেই রাত্রেই কিংশুক মিণ্টুকে গভীর সান্নিধ্যে কাছে টেনে শান্ত গলায় বলল, মিণ্টু, তুমি তো মাঝে মধ্যে ওঁকে এক আধটা চিঠি দিতে পারো।

মিণ্টু প্রায় ছিটকে উঠল। কঠিন হলো!

তুমি কী আমায় পরীক্ষা করছ?

ছিঃ মিণ্টু।

কিংশুকের স্বর আহত।

মিণ্টু একটু চুপ করে থেকে বলল, তাতে লাভ?

সব কিছুই কি লাভ লোকসান মেনে করতে হয়?

তবু কাজের একটা যুক্তি তো থাকবে?

না, মানে ভদ্রলোক তো খুবই ইয়ে হয়ে গেছেন মনে হয়!

যদি গিয়েই থাকেন। তোমার তো তাঁর ওপর এত সহানুভূতি জাগার কথা নয়!

মিণ্টু এখন সহজ ভাবেই বলল কথাটা।

কিংশুক বলল, পুরুষ মাত্রেই যে হিংসুটে এ ধারণাটা তোমাদের ভুল মিণ্টু। ধরে নাও, স্বজাতি প্রীতির বশেই আমি ভদ্রলোকের মানসিক অবস্থাটা ফীল করছি। তুমিও যে তোমার মা বাবার দলে নও, সেটা অন্ততঃ বুঝতে দিলে—

মিণ্টু বলল, সেটা চিঠি লিখে না জানালেও বুঝবে।

আমার কিন্তু শুনে পর্যন্ত বেশ মনকেমন করছে।

যাকে চোখেও দেখোনি, তার জন্যে—

হ্যাঁ, তার জন্যে। এবং যাকে চোখে দেখছি তার জন্যেও!

মিণ্টু হঠাৎ বেশ হেসে উঠে বলে, উঃ বাবা! মরতে আমি তোমায় বলতে বসেছিলাম। বেশ সুখে শান্তিতে ছিলে।

কিংশুক বলল, তা হয়তো ছিলাম। কিন্তু তুমি? তুমি কি বেশ সুখে শান্তিতে—

মিণ্টু কিংশুকের গায়ের ওপর মাথাটা লেপ্টে দিয়ে বলে, ছিলাম। সত্যিই ছিলাম। তোমার মতো এমন আশ্চর্য মানুষ আমি কখনো দেখিনি।

এই সেরেছে!

কিংশুক ওর মাথাটা আরো নিবিড় করে বুকে চেপে বলে, আশ্চর্যর তো আবার অনেকরকম মানে গো। তুষার মানবও আশ্চর্য জারোয়ারাও আশ্চর্য!

আঃ! যত সব বাজে কথা।

কিংশুক বলল, তাহলে একটা কাজের কথাই হোক। মনের মধ্যে গভীর একটা কষ্ট চেপে রেখে তুমি সহজ হতে চেষ্টা কোরো না।

তাহলে কী করতে হবে? 'অ-সহজ' হয়ে থাকবো? মানে, কখনো কাঁদবো, কখনো হাসবো, কখনো প্রেমপত্র লিখতে বসব? আর—

নাঃ। তুমিও একখানা আশ্চর্য মেয়ে! আসলে আমিও তোমার মতো আর দেখিনি। ব্যাপারটা কী জানো? মানে, আমি ঠিক

বোঝাতে পারছি না। বলতে চাইছি, তুমি যদি তোমার প্রথম ভালবাসাকে মুছে ফেলতে চাও, ভুলে যেতে চাও, আমার কিন্তু তোমাকে হার্টলেস মনে হবে।

নাঃ, সত্যিই ভাল জ্বালা করেছি তোমার কাছে প্রথম ভালবাসার গল্প করে। হৃদয়হীন ভাবো তো ভেবো। একটা ডাকাবুকো অফিসারের যে এমন অবাস্তব বুদ্ধি তা কে জানতো!

কিংশুক গাঢ় গলায় বলল, আমি কিন্তু একে 'অবাস্তব' ভাবছি না। আমি চাই তোমার সব সুখ দুঃখের শরিক হতে। তুমি যাকে ভালবাসো, সে আমার ঈর্ষার পাত্রই যে হতে হবে, তার কী মানে? ভালবাসার পাত্রও হতে পারে।

এটা কি তোমার ল্যাবরেটরির এক্সপেরিমেন্টের মতো?

মিণ্টু, তুমি আমায় যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছ না। দেখো, তুমি যদি আমার কাছে তোমার ছেলেবেলার গল্প করো, বাল্যপ্রেমের গল্প করো, দেখবে কত হালকা লাগবে!

মিণ্টু ওর খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে সরে এসে বলল, আচ্ছা, মনে রাখবো। এখন ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।

এই রে! আমার যে মোটেই ঘুম পাচ্ছে না। উপায়? এই মিণ্টু!

তারপর আর কথা হয়নি।

মায়ের আচরণে খুব বেশী অবাক আজকাল আর হয় না ব্রততী। তবু ব্রততী বিয়ে করছে। এ খবর শুনে যে মা এমন পাথর হয়ে যাবে তা ভাবেনি।

এই কিছুকাল আগে পর্যন্তও তো সুনীলা মেয়ের 'বিয়ে বিয়ে' করে উচাটন হয়েছে। মেয়ের অনিচ্ছায় রাগ দেখিয়েছে।

'এবার বিয়ে করবে ঠিক করছ?' ভাল।

বলেই মা একেবারে মুখে তালাচাবি।

ভেবেছিল কাকা হয়তো কোন একসময় আগ বাড়িয়ে আহ্লাদ জানিয়ে আদিখ্যেতা করতে আসবে। তাও দেখল না।

শুধু একসময় খুকু এসে ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, জ্যেঠুমা যখন বিয়ে করতে বলেছিল, তখন করলে না আর এখন করছ যে বড় ?

তোকে কে বলল শুনি ?

আমি সব জানতে পারি বাবা।

খুকু হি-হি করে হেসে বলে তুমি যখন বাড়ি থাকো না জ্যেঠুমা তখন রান্নাঘরে ভাঁড়ার ঘরে একা একা দেওয়ালের সঙ্গে কথা বলে। সব শুনতে পাই।

ব্রততী কষ্টে নিজেকে সামলে ঠোঁট কামড়ে বলে দেয়ালের 'সঙ্গে' ? দেয়ালও কথা বলে ?

আহা তাই যেন বলতে পারে! দেয়ালের সঙ্গে মানে দেয়ালকে শুনিয়ে শুনিয়ে। বলে আমার হচ্ছে এক তরকারি নুনে বিষ। একঘটি জলে তেঁতুল গোলা।

তুই এসব কথার মানে জানিস ?

জানবো না কেন ? এক মানে তুমি।

আমি জল ? আমি তরকারি ?

আহা ও তো তুলনা।

ব্রততীর মনে আসছিল বলে, 'আর কী কী বলেছিল রে তোর জ্যেঠুমা' ?

কিন্তু বলতে পারল না। রুচিতে বাধল।

বিকেলের দিকে পূর্ণেন্দুর উপস্থিতিতে কথাটা পাড়ল সুনীলা।

অবশ্য কাকা পূর্ণেন্দু নিরপেক্ষর ভঙ্গিতে সকালের পড়া কাগজটাই আবার পড়ছিল বসে।

সুনীলা বিরস এবং নীরস অথবা কষায় রস মিশ্রিত স্বরে বলল, বিয়ের পাত্র তো নিজেই ঠিক করেছ বুঝলাম। তা বিয়ের খরচপত্রের জন্যে কিছু জমিয়েছ-টমিয়েছ ?

পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা আগুনের হলকা বয়ে গেল ব্রততীর ?

চেঁচিয়ে বলে উঠতে ইচ্ছে করল ন্যূনতম হাতখরচা রেখে

রোজগারের সব টাকাটাই তো তোমার হাতে ধরে দিই মা। জানো না সে কথা?

কিন্তু বলল না।

সেও নীরস গলায় বলল, সানাই বাজিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা তো হচ্ছে না। রেজিস্ট্রী অফিসে যা লাগবে সেটার জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না।

রেজিস্ট্রী করে!

এখন কাকা বলল, অসবর্ণ বুঝি?

অসবর্ণ সবর্ণ জানি না। ওটাই ঠিক হয়েছে।

কাকা এখন আহ্লাদে গলায় বলে উঠল, বাঃ। বাড়িতে এই প্রথম 'কাজ', বিয়ের কিছু হবে না? ছেলেমেয়ে দুটো তো দিদির বিয়ে শুনে নাচছে।

ব্রততী হঠাৎ হেসে উঠল।

ব্রততী তারপর বলল, তাতে আর বাধা কী? নাচতে তো আর পয়সা লাগে না!

বৌদি। মেয়ের কথা শুনছো?

আমি ঢের শুনেছি। তুমি শোনো।

কাকা বলল, আজ যদি ওর কাকী থাকতো - ঘটা না করে ছাড়তো? সেই সেবার বিয়ে বিয়ে করে—

একথার কেউ উত্তর দিল না।

সেদিন এই পর্যন্ত।

দিন দুই পরে সুনীলা বলল, কবে দিন স্থির করেছ?

এই নিষ্ঠুরতার সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ মনে হলো ব্রততীর, ছেলের বৌয়ের শাশুড়ী হবার উপকরণ দিয়েই তৈরি হয়েছিল মা।

তারপর তাচ্ছিল্যের গলায় বলল, হলেই হলো একদিন।

তাহলেও আগে থেকে বলে রেখো। নেহাৎ সেদিন আর মাছ ভাতটা না খেলেই ভাল। আর শোনো—কাকা বলেছে একখানা ভাল শাড়ি তোমার জন্যে কিনে রেখেছে। আর তোমার ঠাকুমার রেখে যাওয়া একছড়া সরু হার আছে। সেই দুটো পরে যেও।

ব্রততী বলল, মনে রাখব। আর কিছু বলার আছে?

আর কী বলার? আমার যা একটু সোনাদানা ছিল মেয়ের বিয়ের জন্যেই রেখেছিলাম। তো এখন দেখছি—ভবিষ্যতে হয়তো তাই বেচেই খেতে হবে।

ব্রততী আর পারল না।

বলে উঠল, কেন? পূর্ণেন্দুবাবুর বাড়িতে রাঁধুনীর মাইনে না হোক দুবেলা দুটি খেতেও পাওয়া যাবে না।

কী বললি? কী বললি?

যা বললাম শুনলেই তো।

এতো বড় কথা বলতে পারলি তুই?

ব্রততী একটু চুপ করে থেকে বলল, অনেক 'ছোট কথা' শুনতে শুনতে একটু 'বড় কথা' বলতে ইচ্ছে হলো মা।

চলে গেল সেখান থেকে।

কিন্তু সুনীলা কী ছাড়বার পাত্রী?

সুনীলা এখন মেয়ের এই বেলা গড়িয়ে অবেলায় বিয়ের খবরে কোন উৎসাহ পাচ্ছে না।

বেশ একটা ছন্দে এসেছিল সংসারটি। মেয়ের টাকাটা মাস মাস দ্যাওরের হাতে তুলে দিয়ে বেশ আত্মপ্রসাদ অনুভব করছিল সুনীলা।

ভাবটা যেন দ্যাখো বাবা দু হেঁশেল 'এক' হয়ে গেছে বলে যে তুমি লোকসানে পড়ে যাচ্ছো তা ভেবো না। আমরা আমাদের পয়সাতেই খাচ্ছি। বরং তুমিই বিনা মূল্যে আমার গতরের আর খাটাখাটুনির উপস্বত্বটি পাচ্ছো।··· এ এক আশ্চর্য মনস্তত্ত্ব।

কিন্তু মেয়ে হঠাৎ এই দুঃসংবাদ দিয়ে বসে যেন সুনীলার সাজানো ঘুঁটি এলোমেলো করে দিয়েছে।

সুনীলা তাই এখন ভাবল ডুবেছি না ডুবতে আছি! কথাটা যখন পড়েছে, সবটা বলে নেওয়াই ভাল। আবার কখন কথা বলার পরিস্থিতি হবে কে জানে।

সুনীলা তাই আবার মেয়ের পিছু পিছু তার ঘরে এসে বলল,

গয়নার কথা এভাবে বলার ইচ্ছে আমার ছিল না। তোমায় একেবারে বঞ্চিত করার ইচ্ছেও ছিল না। শুনছিলাম এখন নাকি আইন হয়েছে বিয়ে হওয়া মেয়েও বুড়ো মা-বাপের ভার নিতে বাধ্য। তা সেরকম ব্যবস্থা যদি সত্যিই হয় তো চুড়িটা বালাটা—

ব্রততী ফিরে দাঁড়াল।

দুহাত জোড় করে বলল, দোহাই তোমার, এবার আমায় রেহাই দাও। ওই নিয়ে আর মাথা ঘামিও না। বিয়ে-টিয়ে করছি না। নিশ্চিন্ত থেকো যতদিন বাঁচবো তোমার ভার নিতে বাধ্য থাকবো।

কথাটা বলে ফেলে অবাক হয়ে গেল ব্রততী। এতোটা নিষ্ঠুর কথা উচ্চারণ করল কে? ব্রততী?

কিন্তু আর এখন কিছু করার নেই। উচ্চারিত শব্দকে ধরে রাখবার যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে জগতে কিন্তু ফিরিয়ে আনবার যন্ত্র এখনো পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি।

সুনীলা কি হঠাৎ ভয়ানক ভয় পেয়ে গেল?

তা নইলে সুনীলা হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠে মেয়ের মন ভেজাবার আর মান রাখবাব চেষ্টা করতে পারল না কেন?

সুনীলা কাঠ হয়ে তাকিয়ে থাকল।

সুনীলার স্খলিত স্বর থেকে অস্ফুট একটা শব্দ উচ্চারিত হলো, বিয়ে করবি না!

দিব্য বলল, এই সৌম্য 'জ্যোতি টেলারিঙে' তোর পাঞ্জাবির মাপ দিয়ে আয় দিকি। যা বলবার বলা আছে।

পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবি মানে?

চমৎকার। পাঞ্জাবি মানে জানিস না?

আহা। কী হবে সেটা?

পরা হবে।

দিব্য খুব মুরুব্বির গলায় বলে, তুই কি তোর ওই শার্ট প্যাণ্ট পরে বিয়ে করতে যাবি?

দাদা।

কী? কী হলো?

বড্ড বাড়াবাড়ি করছ তোমরা। কোন মানে হয় না।

দাদার কোন কাজেই তো তুই কোন মানে খুঁজে পাস না। যা বললাম কর তো।

সৌম্যর ভারী অবাক লাগে।

বাড়ির আবহাওয়াটা এমন হালকা হয়ে উঠল কী করে? দাদা কথা বলবার সময় বৌদির মুখের দিকে বারবার তাকিয়ে দেখছে না, বৌদির অনুপস্থিতিতেই একটা ডিসিশান নিয়ে বসছে।

মনে মনে বলল, ব্রততী আমি আমার মা ঠাকুমার ভাষায় বলি, 'তুমি খুব পয়মন্ত মেয়ে।'

বলল, এখনই যেতে হবে?

আরে এখন মানে আর কী তোর সময় মতো। তবে ওই জ্যোতির সুরেশবাবু যা দেরি করে—

তার মানে এখনই।

সৌম্য হাসল।

বলল, বেরুবো একটু পরে ঘুরে যাব ওখানে। তবে তোমরা যেন বড় বেশী পাগলামি করছো।

বেরোবার সময়ই দেখল লেটার বক্সে একটা ডাকের খামে চিঠি। ছোট্ট কাঁচের জানলাটি দিয়ে যেন উঁকি মারছে।

চিরপরিচিত প্রিয় হাতের অক্ষর।

সৌম্য মনে মনে হাসল।

সেদিনের পর ব্রততী নিজেই বলেছিল হ্যাখো এখন থেকে এক সপ্তাহ আমরা দেখা করব না।

অপরাধ?

অপরাধ নয়, সংযমের শিক্ষা। তাছাড়া—

একটু হেসে চুপ করে ছিল।

সৌম্য বলেছিল, তাছাড়া কী?

তাছাড়া? তাছাড়া একটু নতুন হওয়া।

তা সেই সাতদিনের মধ্যেই চিঠি লিখে বসল একটা।

মনে মনে হাসল সৌম্য।

এখন আর বেরোনো যায় না।

চিঠিটা বার করে নিয়ে নিচের তলার ঘরেই বসে পড়ল একটা কেঠো চৌকিতে। চিঠিটা খুলল।

তারপর বসেই থাকল।

কে জানে পাঁচ মিনিট না দশ মিনিট? নাকি এক ঘণ্টা? অথবা এক যুগ!

মহোৎসাহে নিমন্ত্রণ পত্রের বয়ান লিখছিলেন প্রবাসজীবন। চৈতালী বলেছে আজকাল আর কেউ যথাবিহিত সম্মানটম্মান লেখে না।

ওঃ। তাই বুঝি? সম্মান দেখানোটেখানো সেকেলে হয়ে গেছে?

চৈতালী আর কিছু বলেনি শুধু দুখানা শুভবিবাহের চিঠি টেবিলে রেখে বলল, আজকাল এই ধরনের লেখে, তাই বলছিলাম—

প্রবাসজীবন একটু অবাক হলেন, এ আবার কী! একরকম আটপৌরে ভাষা।

'আমার মধ্যম পুত্র বা অমুকের কনিষ্ঠা কন্যা' নয়? 'আমার মেজ ছেলে' 'অমুকের ছোট মেয়ে'!

এই আধুনিকতাটি (ওদের ইচ্ছা অনুযায়ী) বজায় রেখে কী ভাবে নিজের ফর্মে আনা যায় তাই ভাবছেন, সৌম্য ঘরে ঢুকল।

এবং বিনা ভূমিকায় বলে উঠল, বাবা! ভেবে দেখছি 'ওল্ড়-হোমই' তোমার পক্ষে সুবিধে।

ওল্ডহোম।

প্রবাসজীবন যেন শব্দটা জীবনে এই প্রথম শুনলেন।

সৌম্যের সেই বকুনির পর ওই শব্দটা তো আর মুখে আনেননি। আর সৌম্যের বিয়ের বার্তা শোনার পর থেকে তো মনের কোণেও আনেননি।

চোখ থেকে চশমাটা খুলে নামালেন।

বললেন, বোস।

সৌম্য বসল না। বলল, ঠিক আছি।

ঠিক নেই বাবা সেটা দেখতে পাচ্ছি। নতুন কী হলো? বল শুনি।

সৌম্য বলল, তার থেকে সহজ হবে পড়ে দেখা। পড়ে দেখতে পারো।

হাতের সেই বহুবার পঠিত চিঠিখানা বাবার সামনে ফেলে দিল।

বহুবারই পড়তে হয়েছে। মানেটা যেন সহজে মাথায় ঢুকছে না।

প্রবাসজীবন চিঠিখানা খাম থেকে বার করে বললেন, এ তো তোমার চিঠি!

সকলেরও হতে পারে। তাহলে আমার একটা খাটুনি বাঁচে।

প্রবাসজীবন ছেলের অস্থিরতা অনুভব করলেন।

বললেন, তুই যখন বলছিস মনে হচ্ছে পড়ার দরকার আছে।

চশমাটা আবার তুলে নিয়ে পড়লেন—

সৌম্য।

ভেবে দেখলাম 'বিয়ে'র মতো বিলাসিতা আমাদের মতো গরীব ঘরের মেয়ের সাজে না। তাই ক্ষমা চাইছি। আমাকে মায়ের সঙ্গেই থাকতে হবে। সেটাই আমার ললাটলিপি। তবে ভবেশ ভবনের ট্রাস্টীরা যদি আমাকেও উদয়ের মতো বিনা ভাড়ায় একটু আশ্রয় দেয় তাহলে হয়তো অবস্থা কিছুটা সহনীয় হতে পারে। চেষ্টা করে দেখবে?

প্রবাসজীবন চিঠিটা মুড়ে আবার খামে পুরে নামিয়ে রাখলেন। চশমাটা আবার খুলে হাতে রাখলেন।

কোন কথা বললেন না।

সৌম্য অস্থির চাঞ্চল্যে বার কয়েক ঘরের মধ্যে পায়চারি করে সরে এসে বলল, আমি হয়তো কয়েকদিনের জন্যে বাইরে কোথাও যেতে পারি। তার আগেই তোমার একটা ব্যবস্থা করে ফেলতে পারবো।

প্রবাসজীবন হাতটা একটু নেড়ে আস্তে বললেন, দরকার হবে না।

দরকার হবে না।

প্রবাসজীবন বললেন, নাঃ। দেখছি ওটা একটা অর্থহীন আবদারই করা হয়েছিল। আসলে আমাদের দৃষ্টিটা তো সবসময় স্বচ্ছ থাকে না। ছোট গণ্ডি কেটে নিজেকে তার মধ্যে ভরে রেখে নিজের দুঃখ আর বেদনা সমস্যা আর অসুবিধে, এইগুলোকে মস্ত বড় করে দেখি আর ভাবি আমার মতো দুরবস্থা আর কারো নেই। আমার মতো দুঃখী দুনিয়ায় আর কেউ নেই। দৃষ্টির এই ভুলের ধুলো ধুয়ে তাকিয়ে দেখি না সংসারে কতজনের কত সমস্যা। হয়তো প্রতিটি মানুষেরই। নিজেকে বড় করে দেখার অন্যায় অভ্যাসেই অন্যকে ভারাক্রান্ত করি। অন্যকে ব্যস্ত করি। তুই আর আমার চিন্তায় ব্যস্ত হসনি। আমি বেশ আছি।

বরাবর বেশ থাকতে পারবে?

প্রবাসজীবন বললেন, যদি হতাশার কাছে আত্মসমর্পণ না করে বিশ্বাস করতে শুরু করি, আমি বেশ আছি ভাল আছি, ঠিকই ভাল থাকব।

একটু থামলেন প্রবাসজীবন।

নীরবে বসে থাকা ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, চোখদুটো ভাল করে খোলা রেখে তাকিয়ে দেখলে নিজের ছোট স্বার্থ ছোট দুঃখকে বড় করে তোলার জন্যে লজ্জাই লাগে।

সৌম্য খুবই বিচলিত রয়েছে এখন।

সৌম্য শুধু নিজের কথাই ভাবছে না। ভাবছে সমগ্র পরিবারটার আশা ভঙ্গের বেদনার কথা। লজ্জায় মরে যাচ্ছে।

এতটা বিচলিত বলেই সৌম্য বলে ফেলে, ভাবতে পারো বাবা একটা মেয়ের জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল তার নিজের মায়ের স্বার্থবুদ্ধি আর নিষ্ঠুরতার ফলে।

প্রবাসজীবন বললেন, ভাবতে কষ্ট হয়। তবু এটাও জানি সব

থেকে বেশী আঘাত আসে মানুষের সব থেকে আপনজনের কাছ থেকেই। অন্যের নিষ্ঠুরতা অন্যের স্বার্থবুদ্ধি রাগ আনে আক্রোশ আনে বিরক্তি আনে। কিন্তু আপনজনের হৃদয়হীনতাই ক্ষয় করে ক্ষত সৃষ্টি করে?

আবার একটু চুপ করে থেকে বলেন, আগে এত ভাবনাটাবনার ধার ধারতাম না বুঝলি? এখন অবিরত নিজের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে ভাবতে ভাবতে দেখতে পাই অনেক প্রশ্নের উত্তর নিজের মধ্যেই মেলে।

* * *

দিব্য বলল, গিয়েছিলি?

সৌম্য অবাকের ভঙ্গিতে বলল, কোথায়?

বাঃ। জ্যোতি টেলারিঙে!

হা হা হা।

হঠাৎ খুব জোরে হেসে উঠল।

বলল, তোমরা তাহলে সত্যিই ভেবে নিয়েছিলে বিয়ে করছি।

কী? বিয়ে করছিস না?

মাথা খারাপ। খুব একখানা ধাপ্পা দিয়ে কদিন তোমাদের বেশ মজায় রাখা গেল।

অ্যাঁ। কদিন আমাদের মজায় রাখার জন্যে—

কেন! মন্দ কী? বাড়িতে সারাক্ষণ গোমড়া মুখের চাষ। তবু কদিন হা হা হা!

এছাড়া আর কোন উপায় ছিল না সৌম্যর।

বাবার কাছে পর্যন্ত চলতে পারে। তাও নিরুপায় হয়ে। কিন্তু বাড়িতে জনে জনে সকলের কাছে অত ছোট হতে পারা যায় না।

দিব্য বলল, শুনলে কাণ্ড?

শুনলাম। কিন্তু বিশ্বাস করলাম না।

বিশ্বাস করলে না?

অবিশ্বাস্য বলেই করলাম না।

তাহলে?

তাহলে অন্য কিছু।

আমার বুদ্ধির বাইরে।

তোমার বুদ্ধির পরিধিটা খুব বেশী বলে মনে হতো তোমার ?

বৌকে নিঃসঙ্গতার হাত থেকে বাঁচাতে কিংশুক অন্য কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে অফিস থেকে বার দুই টেলিফোন করে।

কি করছ ? কেমন আছো ? সারা দুপুর কাঁচেনে পড়ে আছো না তো ?

এইসব কথা।

তবে অপরাহ্ন বেলার ফোনে বেশীর ভাগ দিন একই কথা—এই, হয়তো ফিরতে একটু রাত হতে পারে। রাগ কোরো না।

ওঃ। আমার রাগে তো সাহেব পিঁপড়ের গর্তয় লুকোতে যাবেন।

যাব না ? বল কী ?

থাক। ঢের হয়েছে। রোজ দু'বার করে বাড়িতে ফোন। অফিসের লোকেরা ভাবে কী ?

কিছু ভাববার মতো লোকই নেই ধারে কাছে। এই মিণ্টু কী করছো এখন ? কিছু না ? কী মুস্কিল কিছু না করে থাকা যায় ? একটু ঘুমোতেও তো পারো।

ওহো হো তাও তো বটে। দুপুরে ঘুমোয় বোকারা।···সেই তো মুস্কিল বাংলা বই এখানে বড়ই দুর্লভ। একজন কলকাতায় যাবে, তাকে বলেছি, একটা লিস্ট দিয়ে। আসলে ব্যাপার কী জানো ? কেউ সহজে অন্যের ভার নিতে চায় না। প্লেনে আসে তো।

এই মিণ্টু বাড়ি থেকে একটা চিঠি এসেছে। মা লিখেছেন, পুজোর সময় আমাদের যেতে। পুজো মানে তো সেই অক্টোবর ? মা এই মে মাস থেকেই তার সুর ভাঁজছেন।

এসব কথা বাড়ি এসে বললেও চলে।

তবু অফিসের কাজের সময় এ সব বলা চাই।

যদিও শেষমেষ একটা কথায় গিয়ে ঠেকে, মিণ্টু, বোধহয় আজ ফিরতে একটু দেরি হবে—

মিণ্টু বলে, ফোনে বলবার জন্যে তোমার বুঝি একটা ক্যাসেট তৈরি করা আছে?

অ্যাঁ। কী বললে, ছি ছি। মিণ্টু এই তোমার পতিভক্তি? এত নতুন নতুন কথা বলি। হায় হায়।

তবু আজও কিন্তু কিংশুক অনেক কথার পর বলেছিল, শোনো, আজ বোধহয় ফিরতে একটু—

আজও কিংশুক ওই কথাই বলেছে।

ফিরতে একটু দেরি হবে। একটা পার্টি আছে।

শুনে আজ কেন কে জানে একটু মুক্তি মুক্তি ভাব এল মিণ্টুর।

যাক তাহলে এক্ষুণি উঠে চুল বাঁধতে হবে না, বৈকালিক স্নানটা সেরে নিতে হবে না। এবং 'পার্টি' আছে যখন, তখন জলখাবারের ব্যবস্থায় রান্নাঘরে যেতে হবে না।

যেদিন পার্টি থাকে সেদিন কিংশুক বাড়ি ফিরে চাও খায় না।

সারাদিন খুব গরম গেছে। বিকেলের দিকে চমৎকার ঝোড়ো ঝোড়ো হাওয়া বইছে।

মিণ্টু জানলার ধারে একটা মোড়া পেতে বসে হাওয়াটাকে যেন তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছিল।

হঠাৎ পিছন থেকে কাঁধে হাতের স্পর্শ।

মিণ্টু চমকে বলল, এ কী! এসে গেছ? বলেছিলে পার্টি আছে—

দাঁড়িয়ে উঠল মিণ্টু।

কিংশুক বলল, কী মুস্কিল! এত ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াবার কী আছে? তাড়াতাড়ি চলে এসে দেখছি একটু খারাপ কাজ করেছি।

মিণ্টু ভুরু কোঁচকালো।

বলল, এ আবার কী কথা। এত ঢং করো, উঃ।

কিংশুক বলল, বিশ্বাস করো, ঢং নয়। সত্যিই তাই মনে হচ্ছে।

এমন গভীর ধ্যানমগ্ন হয়ে বসেছিলে তুমি। ধ্যানভঙ্গের অপরাধ বোধ করছি।

মিণ্টু আবার ভুরু কোঁচকালো, ধ্যানমগ্ন! 'সমাধি' হয়ে যায়নি তো?

অনেকটা। খোলা চুল হাওয়ায় উড়ছে। আবছা আলোয় মুখ দেখা যাচ্ছে না, বসার ভঙ্গিটি প্রায় স্ট্যাচুর মতো। দেখেই মনে হলো যে কোন শিল্পীর কাছে লোভনীয় মডেল। কিছু না হোক হাতে যদি ক্যামেরাটা থাকতো, ছবিটি চিরকালের মতো ধরে রাখতাম। তলায় ক্যাপশান দিতাম, স্মৃতিভারে আত্মমগ্ন বিরহিণী।

মিণ্টু চোখ পাকিয়ে বলল—পার্টিতে বুঝি বোতলের খুব ঢালাও কারবার চলেছিল? লোভ সামলাতে পারোনি?

কিংশুক টাইটা খুলছিল, সেটা খাটের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ত্বহাতে মিণ্টুকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, এই মিণ্টু ভাল হবে না বলছি। মানহানির মামলা তুলব।···উঃ, মা আমায় বলেছিল, কলকাতার মেয়েরা বড্ড বেশী ওস্তাদ, তুই পেরে উঠবি না। তোর বিদ্যেই আছে, বুদ্ধিসুদ্ধির তো বালাই নেই। তাই একখানা মফস্বলের মেয়ে যোগাড় করে বিয়ে দিচ্ছি। এখন মা দেখুক এসে মফস্বলের মেয়েও কী চীজ হয়।

মিণ্টু বলল, মা সত্যি বলেছিলেন এ সব?

বলেছিলেনই তো।

আগে বলবে তো? তাহলে একটু ভ্যাবলা ভ্যাবলা গাঁইয়া মার্কা হয়ে থাকতুম। ছাড়ো। তোমার বেঙ্কটেশ্বর হয়তো দরজায় এসে দাঁড়াবেন।

কিংশুক অবশ্য ওর নির্দেশ মানল না। বরং ধরে রাখার চাপটা বেশী অনুভব করিয়ে বলল, যতই উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করো, ঠিক বলো তো খুব মন খারাপ করে স্মৃতির সমুদ্রে ডুবে বসেছিলে কিনা?

মিণ্টু বলল, ছিলাম তো ছিলাম। মানুষ বৈ তো ইট পাথর নয়।

ঠিক।

কিংশুক ওর চুলের ওপর গালটা ঠেকিয়ে বলল, আমিও তো তাই বলি মানুষ তো ইট পাথর নয়। কিন্তু তোমার যেন সাধনাই হচ্ছে ইট পাথর হবার। জীবনের প্রথম প্রেম কখনো মুছে ফেলা যায় না।

এই গভীর গাঢ় গলার সহানুভূতির বাণীতে মিন্টুর চোখে জল এল। তবু সামলে নিয়ে বলল, তোমার তাহলে আছে এ অভিজ্ঞতা?

কিংশুক বলল, বলতে লজ্জা করছে কিন্তু বলতেই হচ্ছে অভাগার কপালে। না শৈশবে না বাল্যে, না কৈশোরে একখানা প্রেমিকা আর জুটল না ভাগ্যে। ওই সব সোনার দিনগুলো বোর্ডিঙে হোস্টেলেই কেটে গেল। একটু কিছু সম্বল থাকলেও তোমার কাছে এমন গোহারান হেরে যেতাম না।

কিংশুকের হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে মিন্টু বিহ্বল হয়, মুগ্ধ হয়। মানুষ এমন মহৎ সুন্দর আর এমন উদার হয়? অথচ আবার তার সঙ্গে এমন 'জলি' কৌতুকপ্রিয়।

এই হৃদয়ভরা দরদের কাছে নিজেকে বিকিয়ে না বসে পারা যায়?

তবে মিন্টুও সেন্টিমেন্টকে সযত্নে পরিহার করে।

তাই বলল, সব কিছুতেই তো আমার নাগালের অনেক উঁচুতে এই একটা জায়গায় না হয় হেরেই থাকলে। তো বলো এখন কী খাবে? চা? না কি কফি?

কিচ্ছু না। পার্টিতে ও সব বার কয়েক হয়ে গেছে।

তারপর খুব অমায়িক মুখে বলে যা খেতে চাই তাতে তো রাজী হবে না। বলবে, 'এই এই ওখানে বেঙ্কটেশ্বর ঘুরছে।...এই এই বাগানে ত্রিচুরেশ্বর ঘুরছে। আরে আরে গাছের ওপর দুটো পাখি দুজোড়া চোখ নিয়ে ড্যাবডেবিয়ে তাকিয়ে আছে।'

হেসে ফেলে মিন্টু।

কিংশুকের কথার ভঙ্গিতে না হেসে থাকা যায় না।

কিংশুক বলল, কাছে এসো। ভয় নেই দু ফুট দূরে বসলেও চলবে। দারুণ একখানা সারপ্রাইজ আছে তোমার জন্যে।

মিণ্টু কাছে সরে আসে।

কী ব্যাপার? না কি স্রেফ চালাকি?

কিংশুক কি কিছুক্ষণ আগে দেখা সেই 'স্মৃতিভারে অবসন্ন' মূর্তিটি দেখে পর্যন্তই তাকে 'সহজ' করে আনতে চাইছে? ভাবছে ঠিক সেই ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তার 'সারপ্রাইজটা' অধিক ভারী হয়ে উঠছে কিনা।

তাই বলে উঠল, চালাকি! হায়। একটা মফস্বলের মেয়ের কাছে আমার কী হাল! ওঃ। অফিসে নিয়ে গিয়ে যদি দেখাতে পারতাম! সেখানে চৌধুরী সাহেবের কী একখানা পোজিশান। যাকগে—এখন চোখ বোজো তো।

চোখ বুজবো!

হ্যাঁ চোখ বুজে হাত পাতবে।

মিণ্টু ধারণা করে নিল নির্ঘাৎ হাতে একখানা চকোলেট ধরিয়ে দেবে।

চোখ বুজল। হাত পাতল।

কিন্তু এ আবার কী!

মিণ্টু অবাক হয়ে হাতের ওপর এসে পড়া ডাকের খামে মোড়া চিঠিখানার দিকে তাকাল।

কার হাতের লেখা?

'প্রেরকের' জায়গায় কার নাম?

সারা শরীরের মধ্যে একটা ভূমিকম্প ঘটে গেল যেন।

তবু ভেতরের আলোড়নকে শান্ত সংহত করে নিয়ে মিণ্টু চিঠিটা পাশে বিছানার ওপর রেখে কিংশুকের ছুড়ে ফেলা টাইটা গুছিয়ে পাট করতে বসল।

কিংশুক যা বোঝবার ঠিকই বুঝল। তবু বলল, কী হলো? 'গ্রামের জ্ঞাতির চিঠির' মতো অবহেলায় ফেলে রাখলে যে?

মিণ্টুই বা হারবে কেন? মিণ্টু বলল, দেখতেই তো পাচ্ছো প্রেমপত্র। হাটে বাজারে খুলে পড়তে বসবো না কী?

ওঃ। তাও তো বটে। সরি। হতাশ প্রেমিকের হৃদয় উচ্ছ্বাস। আচ্ছা আমি ততক্ষণ স্নানটা সেরে আসি। তুমি নির্জনে নিভৃতে—

একটু হেসে বলল, ভদ্রলোককে কিন্তু খুবই সরল বলতে হবে। মিসেস চৌধুরীকে লেখা প্রেমপত্র মিস্টার চৌধুরীর কেয়ারে তার অফিসের ঠিকানায়।

মিণ্টু চোখ তুলে তাকাল।

বলল, সরল কিনা জানি না। তবে আমার সঙ্গে যে একটি ভদ্রব্যক্তির বিয়ে হয়েছে এ বিশ্বাস রেখেছে।

কিংশুক আলনা থেকে পাট দুরস্ত পায়জামা আর গেঞ্জি টেনে নিয়ে কাঁধে ফেলে দীর্ঘশ্বাসের ভঙ্গিতে বলতে বলতে চলে গেল, মা গো! দেখে যাও তোমার 'মফস্বলের মেয়েকে'।

চিঠিখানা দেবার আগে যথেষ্ট সন্দেহ যে মিণ্টু কাঁদবে। আর সেটাই স্বাভাবিক।

বিষণ্ণতা চোখের জল এসব একদম সহ্য করতে পারে না কিংশুক। অর্থাৎ তার মোকাবিলা করতে পারাও তার বেশ কঠিন মনে হয়।

যাক স্নানের ঘরে বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়ে আসা যাবে।

কিন্তু এই কী মিণ্টুর 'প্রেমপত্র'? কিংশুকের ভাষায় 'হতাশ প্রেমিকের হৃদয় উচ্ছ্বাস'?

এর জন্যে মিণ্টুর সারা শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল? আর সারা হৃদয়ে ভূমিকম্পের আলোড়ন উঠেছিল আর চিঠিটা পড়ার পর কী করে কিংশুকের কাছে স্বাভাবিক ভাব বজায় রাখবে তাই ভাবনা করছিল মিণ্টু?

মিনিট দুই খামটা হাতে নিয়েই বসেছিল মিণ্টু, খুলতে পারেনি। তারপর হঠাৎ মনে পড়ল কিংশুক যদি এসে দেখে মিণ্টু এখনো অনড় হয়ে বসে আছে, চিঠিটা খোলেনি সেও তো এক লজ্জা।

কিন্তু না। লজ্জার কিছু কারণ রাখেনি অরুণ।

বেশ কিছুক্ষণ পরে এল কিংশুক। স্নানের ঘর থেকেই সাফ-সুৎরো হয়ে।

মিণ্টু হাত বাড়িয়ে চিঠিটা এগিয়ে দিয়ে বলল, এই নাও পড়ো। হতাশ প্রেমিকের হৃদয়োচ্ছ্বাস।

কিংশুক দু'পা পিছিয়ে গেল। ভয় পেল মিণ্টু কি ওর ঠাট্টার কথাটাকে সত্যি ভেবে যুদ্ধে নামতে চাইছে?

বলল, সর্বনাশ! আমি পড়ব কী?

পড় না। কিছু এসে যাবে না।

না না। রাখো তো পাগলামি।

পাগলামি না। সত্যিই তোমায় পড়তে দিচ্ছি। কারণ উত্তরটা দিতে তোমার পরামর্শ দরকার।

কিংশুক একটু কেঁপে উঠল।

কী রে বাবা। লোকটা এখন মরিয়া হয়ে মিণ্টুকে ডিভোর্সে প্ররোচিত করতে চাইছে? তাই বেপরোয়া ভাবে চিঠি পাঠিয়েছে কিংশুকের কেয়ারে।

বলল, নাঃ। পরের চিঠি পড়তে নেই।

পড়লে ক্ষতি ছিল না।

বলে চিঠিটা ফেলে রেখেই মিণ্টু উঠে গেল।

কিংশুক অবশ্য এই সুযোগ দেওয়া সত্ত্বেও চিঠি খুলে পড়ল না। তবে পড়লে এইটা পেতো—

মিণ্টু দোহাই তোমার। তোমার হুকুমটি ফিরিয়ে নাও। 'বড়-লোক হওয়া' আমার হবে না। তুমি নির্দেশ দিয়েছিলে 'সৎ অসৎ যে উপায়েই হোক, বড়লোক' আমায় হতেই হবে। পাড়াতুতো জ্যাঠা-জ্যেঠির 'মুখের মতো' জবাব দিতে হবে।...কিন্তু কী করব বল, তোমার অরুণদা লোকটা নেহাৎই একটা অপদার্থ। কোন ক্ষমতাই দেখাতে পারে না।

দেখছি 'সৎ উপায়'টা নেহাৎই কমজোরি, তাতে হাড়ভাঙার বিনিময়ে যৎসামান্য একটু সচ্ছলতার মুখ দেখা ছাড়া আর কিছু হয় না।...আর 'অসৎ পথ'? সেই পথটা যে কোন্ পথে তার কোন হদিসই পেলাম না।

অতএব তোমার হুকুম মানতে না পারার জন্যে ক্ষমা করো লক্ষ্মীটি!

আর ভেবে দেখো তাতে লাভটা কী?

এখন কী আর ওই 'মস্ত বড়লোক' হয়ে উঠে লাভের খাতায় কোন 'অঙ্ক' তুলতে পারা যাবে? লাভের মধ্যে চিরকাল গুরুজন বলে মেনে আসা দুটি বুড়ো বুড়িকে তাঁদের অহঙ্কারের সমুচিত জবাব দেওয়া।···দূর। মানে হয় কিছু?

ভেবে দেখো, স্রেফ ছেলেমানুষি নয়?

লাজ লজ্জার মাথা খেয়ে আবার যথাস্থানে ফিরে এসেছি, বসেছি। যথাপূর্বং ডেলি পাষণ্ডর ভূমিকা পালন করে চলেছি। কারণ মার শরীরটা বড্ড বেশী ভেঙে পড়েছে। একা রাখা চলে না।

নাটুর দিদিমাকে তো চেনো? সে এসে রান্নাটান্না করে দিয়ে যায় বাকিটা আমার সাধ্যে যা কুলোয়।

এখন অনুভব করছি খুব, যা হয়েছে ভালই হয়েছে। তোমার ভাগ্য তোমায় রাজরানী না করে ছাড়বে না। জোর করে তার বিপরীত কিছু ঘটাতে গেলে কী হতো বলো? খাটতে খাটতে হাড়-কালি হতো, আর দেখে দেখে অরুণ নামের অক্ষম অপদার্থ এই হতভাগাটার 'জীবন মহানিশা' হয়ে যেতো। (তোমার ভাষাটা ব্যবহার করলাম)।

আশা করছি খুব ভাল আছো। খুব ভালো থাকবে। ভালো আছো এটা জেনেই শান্তি আনন্দ।

সকর্তা আমার শুভেচ্ছা নাও। ইতি

অরুণদা

উত্তরে মিন্টু লিখল—

অরুণদা। দুর্বুদ্ধি মিন্টুর হুকুম মানা যে তোমার কর্ম নয়, তা জানতাম। সে আশা রাখিওনি। সব 'পথ'-এর ঠিকানা সকলের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। সে যাক, পলাতক আসামীর মতো গৃহত্যাগ করে বাউণ্ডুলে হয়ে না বেড়িয়ে যে আবার 'ডেলি পাষণ্ডের' ভূমিকায় ফিরে এসেছ জেনে খুশী হলাম।

তবে খুব মন খারাপ লাগছে নতুন কাকিমার শরীরের অবস্থা শুনে। এই ভেঙে যাওয়াটা শুধুই শরীরের নয়। নাটুর দিদিমাকে

দিয়ে এ সমস্যার সমাধান হবে না। অতএব পুরনো হুকুমের বদলে আর এক হুকুম—কাকিমার ঘরে একটি বৌ এনে দাও।

জীবনটা তো নাটক নভেল নয় অরুণদা যে শুধু শুধু সেটাকে বিকিয়ে দেওয়া যায়? আর জেদ করে যদি তাই করতে বসো, আমার জীবনটাও যে মহানিশা হয়ে যাবে সেটা ভেবে দেখো।

মিণ্টু সোনার খাটে গা আর রুপোর খাটে পা মেলে বসে বসে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবে এটা নিশ্চয় চাও না?

তবে হ্যাঁ। যাহোক তাহোক একটা মেয়ে এসে কাকিমার সাজানো সংসারটি লণ্ডভণ্ড করে বসবে, এটি তো হতে দেব না। মেয়ে আমি নির্বাচন করব। (এই পর্যন্ত লিখে মিণ্টু ওর বরের কাছে পরামর্শ চেয়েছিল। আর তারপর লিখেছিল—)

'নির্বাচন করবো' কেন, ধরে নাও করেইছি। আমার একখানা মামাতো ননদ আছে, ভীষণ ভালো মেয়ে। হবেই তো। একটি ভীষণ ভালো লোকের বোন তো? আমার মতো এত সুন্দরী নয় অবশ্য (সে আর তুমি পাচ্ছ কোথায়?) তবে মোটের ওপর নতুন কাকিমা লোক ডেকে বৌ দেখাতে লজ্জা পাবেন না।

বিদ্যে সাধ্যিতে অবশ্য একটু মাটো. হায়ার সেকেণ্ডারির পর বাড়ির সুবিধে অসুবিধেয় আর পড়া হয়ে ওঠেনি। কিন্তু নাই বা হলো? গ্র্যাজুয়েট মেয়ে নিয়ে কী আর ধুয়ে জল খাবে তুমি? রীতিমত বিবেচনার ফলেই এই সিদ্ধান্ত—

বিয়ে করতে যদি রাজী না হও—তাহলে দুই নাক উঁচু অহঙ্কারীকে জানিয়ে দেওয়া হবে তাঁদের কন্যেটির বিহনে তোমার জীবনটি মহানিশা হয়ে বসে আছে।

নেভার। এ হতে দেওয়া যায় না, অরুণদা। আর তেমন হলে সাতজন্মেও আর বাপের বাড়ির দেশে যাওয়া হবে না আমার। যেতে ইচ্ছে করবে না। লজ্জায় মাথাকাটা যাবে। কাকিমার কাছে মুখ দেখাতে পারবো না।

আর অপরপক্ষে?

কাকিমা ছেলে বৌ নিয়ে সুখে ঘরকন্না করছেন জানতে পারলে তবু জন্মভূমিটায় একবার যাবার পথ থাকবে।

এবং সেই সুখের ঘরটিতে নিজ অধিকার বলেই যখন তখন গিয়ে হানা দিতে পারবো। 'ননদের বাড়ি' বলে কথা।

ননদের বাড়ি নিঃসঙ্কোচে যাওয়া চলে, আর ননদাইয়ের সঙ্গে নির্ভয়ে বসে আড্ডা দেওয়া চলে।

তবেই বোঝো—

মিণ্টুর বুদ্ধিটা কী ধারালো।

আসলে কী জানো অরুণদা ভগবান আমায় এমন এক অপূর্ব সুন্দর মানুষের সঙ্গ সাহচর্য আর ভালবাসার স্বাদ দিয়েছেন তার থেকেই একটি নতুন জীবনদর্শন আবিষ্কার করে ফেলেছি। বুঝে ফেলেছি জীবনটা অনেকটাই মানুষের নিজের হাতে।

ভীষণ 'সিরিয়াস' হয়ে যে জীবনটাকে পাহাড়তুল্য ভারী করে তোলা যায়, সেই জীবনটাকেই পাখির পালকের মতো হালকা করে নেওয়া যায়।

এর জন্যে খুব বেশী কিছু লাগে না অরুণদা। শুধু অন্যের প্রতি একটু দরদ সহানুভূতি আর ভালবাসা।

অবশ্য তার সঙ্গে একটু উদারতাও। সারাক্ষণ নিজের 'প্রাপ্য' সম্পর্কে চুলচেরা বিচার করতে বসলে আর হালকা হবার উপায় নেই।

তাহলে বসে বসে পাথরের চাঁই হও। পাহাড় হও।

দারুণ একখানা বক্তৃতা দেওয়া হয়ে গেল কেমন? তা কী আর করা? স্বভাব যায় না মলে। মা চিরকাল বলেছে 'মিণ্টু এক কথা কইতে একশো কথা কয়'।

যাক নতুন কাকিমাকে আমার প্রণাম দিও আর আমার প্রোপোজালটাও দিও বুঝলে? ঘটকালি করতে গেলাম বলে।

সকর্তা তোমায় ভালবাসা জানালাম। লোকটা তো তোমায় না দেখেই তোমার প্রেমে পড়ে বসে আছে।